পটমঞ্জরী

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরভি প্রকাশনী
১, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘী-পূর্ণিমা ১৩৬৭

ছচ্ছদপট : শ্রীগণেশ বসু
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং
মুদ্রণ : চয়নিয়া প্রেস প্রাইভেট লিঃ
গ্রন্থন : মোস্‌লেম্‌ খান এণ্ড ব্রাদার্স

পাঁচ টাকা

সুরভি প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীমতী তপতী পালিত কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীগৌরহরি দাস কর্তৃক তারকনাথ প্রেস, ২ শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা ৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

সড়কের যে-পাশ দিয়ে ওদের গ্রামের দিকে নেমে যেতে হয়, ঠিক সেখানটায় বহুকালের স্থবির এক বটবৃক্ষ তার অসংখ্য ডালপালা আর অজস্র ঝুরি নিয়ে পুরাকালের কোনো ঋষির আশ্রমের মতো স্নিগ্ধ শীতল ছায়া মেলে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, মহীরুহটি এতো প্রাচীন যে, তার মূলকাণ্ডটি বিলীন হয়ে গেছে বহুকাল, এখন তার ঝুরিগুলোই মোটা-মোটা বৃক্ষকাণ্ডে পরিণত হয়ে আরও বেশী যায়গা নিয়ে বিরাট এক বনস্পতি সংসারে শোভিত হয়ে ডালপালা আর পত্র-পত্রিকায় পূর্বসাধকের জয়গান ঘোষণা করছে।

বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই এমনি করে শ্রান্ত পথিককে ছায়াদান করে আসছে এই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ। এরই চন্দ্রাতপতলে একটি হলুদে রঙের প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়, যাকে স্থানীয় লোকেরা আজও বলে, 'বামুন-পৈঠে।'

কোন্ ব্রাহ্মণ যে পথশ্রান্ত হয়ে একদিন এখানে বসে কিছুক্ষণের বিশ্রাম নিয়েছিলেন,—সে-কথা আজকের মানুষ একেবারেই ভুলে গেছে, কিন্তু ভোলেনি বোধহয় এই বনস্পতি।

আজ থেকে আটশো বছর আগে এক দিব্যকান্তি ব্রাহ্মণ বিমর্ষ মনে এই প্রস্তরখণ্ডে এসে বসেছিলেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ সেদিন যেন অগ্নিসমুদ্রের সৃষ্টি করেছে চারদিকে, তার মাঝখানে তরুণ বটবৃক্ষ শ্যামল পত্রছায়া দিয়ে গড়ে তুলেছে এক স্নেহ-কোমল নীড়।

ব্রাহ্মণ মাথা থেকে পাট করা লাল গামছাটি নামালেন, উর্ধ্বাঙ্গ থেকে শ্বেত উত্তরীয়খানা সরালেন। আরেকটি লাল গামছায় পুঁটলী বাঁধা চিঁড়ে গুড় ইত্যাদি রয়েছে। সেটিকে একধারে

রেখে অন্য গামছাখানা নিয়ে ঘর্মসিক্ত দেহটাকে মার্জনা করতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে গ্রামের মোড়লকে দেখা গেল,— পায়ে-চলা আল্-পথ দিয়ে হেঁটে আসছে সে। দূর থেকেই ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলো। দেখে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।

তারপরে একসময় কাছে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো ব্রাহ্মণকে, করজোড়ে প্রশ্ন করলো,—প্রভু, আপনি কে? ব্রাহ্মণ নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন, গাত্রমার্জনাও করছেন, চিন্তাও ছিল। তাই ওর কণ্ঠস্বরে একটু চমকিতই হলেন বলা যায়।

মোড়ল আবার প্রশ্ন করলো,—আপনি কে?

থম্‌থমে গম্ভীর মুখ ব্রাহ্মণের, ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করে বললেন,—আমার পরিচয় জানতে চাইছো কেন?

মোড়ল একটু অপ্রতিভ হলো।

আটশো বছর আগের কথা, সদাচার আর গুণাবলীর জন্য ব্রাহ্মণ সর্বত্রই আদৃত হতেন। শুধু তাই নয়, সবাই চাইতো তাদের গ্রামে ব্রাহ্মণ এসে বসবাস করুন। ব্রাহ্মণ বিত্তশালী ছিলেন না, কিন্তু সবাই তাঁদের সমীহ করে চলতো।

মোড়ল বিনীতভাবে বললো,—ঠাকুর অপরাধ নেবেন না, কৃপা করে যখন আমাদের গাঁয়ের সীমানায় পা দিয়েছেন, তখন আমাদের একটা অনুরোধ রাখতেই হবে।

ব্রাহ্মণের ভ্রূ-দুটি আকুঞ্চিত হলো, তিনি প্রশ্ন করলেন,—কী অনুরোধ?

মোড়ল বললে,—একবার গাঁয়ের ভেতরে যেতে হবে।

ব্রাহ্মণ ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠলেন,- তা কী করে হয় বাপু, আমাকে বহুদূরে যেতে হবে। আমি এম্‌নিতেই তোমাদের আশীর্বাদ করছি।

মোড়ল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে ফের অনুনয় করে বললে,—আমাদের গাঁয়ে কোনো ব্রাহ্মণ নেই, আপনাকে একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

বহু ধরাধরির পর অবশেষে রাজী হলেন তিনি। আলপথ ধরে মোড়লের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন।

এধারে ওধারে কৃষিক্ষেত, মাঝে মাঝে তালীবনের জটলা। ওদের দেখে মনে হয়, বৃহৎ প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন কয়েকটি 'রন্‌-পা' পরা ডাকাত পরস্পরের মধ্যে যুক্তি করছে। নিকষ কালো তাদের দেহবর্ণ, এমনকি 'রণপা'র বাঁশ দুটোও পুড়িয়ে পুড়িয়ে কালো করে নিয়েছে।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে কিছু গাছপালার ছায়া পাওয়া গেল। পথের পাশে আতাগাছের ঝোপ, অন্যদিকে হরিতকী গাছ, কিছু কিছু শালও চোখে পড়ে। তারই মধ্যে সযত্ন-রোপিত আম কাঁঠালের সারি। একটা ঠাণ্ডা ঝির্‌ঝিরে হাওয়া এসে তাঁর গায়ে লাগলো।

ব্রাহ্মণ কথা বললেন এতক্ষণে, জিজ্ঞাসা করলেন,—গাঁয়ের নাম কী হে ?

মোড়ল বললে,—পুঁটে। ভুঁইদারের খাতায় লেখা—পুঁটিয়া।

—কার ভুঁইদারী এটা।

—আজ্ঞে, চোরচিতাতপার রাজপুরুষ। রাজামনিষ্যিও বলতে পারেন।

ব্রাহ্মণ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন,—'চোরচিতাতপা'টা কোথায় ?

মোড়ল বললে,—সুবন্নরেখার ওপারে গিয়ে কয়েক ক্রোশ নদীর কিনার ধরে নেমে যেতে হয়।

ব্রাহ্মণ বললেন,—সুবর্ণরেখা কি কাছেই নাকি ?

মোড়ল বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ের নীচে যে নামপাড়া ? তার তলা দিয়ে বয়ে চলেছেন।

নদীর নামে যেন একটু উৎসাহিত হলেন ব্রাহ্মণ, একটু বা উৎফুল্লও। বললেন, আমাকে একটু দেখাবে চলো ত ?

মোড়ল বললে,—আজ্ঞে, একটু বসে জিরিয়ে-টিরিয়ে নেন, এখন খরার মধ্যে 'তপ্ত বালি'তে হাঁটবেন কী ?

ব্রাহ্মণ কথাটার প্রতিধ্বনি করলেন,—'তপ্তবালি'—বাঃ! বেশ বলেছো ত কথাটা!

তখনকার দিনে গাঁয়ের সাধারণ লোকেরা অভ্যাগতদের সঙ্গে কথাবার্তায় যতদূর সম্ভব মার্জিত ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করতো। এতে তারা প্রচুর আত্মপ্রসাদ অনুভব করতো।

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন,—তোমার নাম কী?

মোড়ল দাঁড়িয়ে পড়ে আভূমি নত হয়ে বললে,—আজ্ঞে, অধীনের নাম কেনারাম টিকাইত।

—তুমিই কি মোড়ল?

—আজ্ঞে।

ততক্ষণে গাঁয়ের কিছু কিছু মানুষ জড়ো হয়েছে একটা জায়গায়,—দূর থেকে ওদের দুজনকে আসতে দেখে। ওরা কাছাকাছি হতেই ব্রাহ্মণকে দেখে সবাই নত হয়ে করজোড়ে প্রণাম জানালেন।

মোড়ল বললে,—এখানে একটু বসুন আজ্ঞে।

ব্রাহ্মণ তাকিয়ে দেখলেন. ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে গোবর-নিকানো বড়ো উঠনের মতো যায়গায়, তার একদিকে একখানা বড়ো ঘর,—মাটির দেয়াল, খড়ের চাল, শক্ত মাটির উঁচু দাওয়ার ওপারে ঘরের ঠিক বিপরীত দিকেও অনুরূপ মাটির উঁচু দাওয়া আর খড়ের চাল, কিন্তু কোনো দেয়াল নেই, চালার নীচে মোটা আর শক্ত শাল খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে গোটাকয়েক।

এ গেল উঠোনের দু'দিকের দুটো ঘরের কথা; দুটি ঘর নয়, যেন দুটি বাহু পায়ে-চলা পথটির ওপর এসে পড়েছে। পথের বিপরীত দিকেও—উঠন পার হয়ে চণ্ডীমণ্ডপের মতো একটা বস্তু। এও খড়ের চাল, মাটির দাওয়া, তবে চালটা উঁচু এবং দোচালা। ওপরের চালটা মন্দিরের চূড়োর মতো।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ব্রাহ্মণ, কে এসে পায়ে হঠাৎ জল ঢালতে আরম্ভ করলো। একটু চমকেই উঠলেন বলা যায়, তারপরে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,—স্বস্তি।

কেনারাম বললে,—ঘরে উঠে আসুন আজ্ঞে। পিঁড়ে পেতে দিয়েছে।

ব্রাহ্মণ ডানদিকের ঘরখানার দাওয়ায় উঠে কাঠের নক্সাকাটা পিঁড়ের ওপর বসতেই আবার পায়ে জল ঢালা হল। একখানা নতুন লাল গামছা দিয়ে পা মুছিয়ে দিল।

কেনারাম বললে,—এবার ভেতরে চলুন।

ঘরের ভেতরে খাট পাতা। তার ওপরে তালপাতার শপ, শতরঞ্চি পেতে ওপরে শীতলপাটি বিছানো রয়েছে।

ব্রাহ্মণ তার ওপরে গিয়ে বসতেই কেনারামের হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল ; দেখতে-দেখতে এসে গেল ফলারের সামগ্রী। দুধ, কলা, চিঁড়ে, সাদা বাতাসা বেশ বড়ো-বড়ো,—কালো পাথরের বাটি আর গেলাস।

পরিতৃপ্ত ফলারের পর ব্রাহ্মণ একটু সুস্থ হয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে গল্প করতে লাগলেন কেনারামের সঙ্গে। ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আর ঘরের মধ্যে বসে আছে বৃদ্ধ মাতব্বর কয়েকজন।

ছোট্ট গ্রাম, এ গ্রামের সবাই কৃষিজীবী। ওপাশে ফাঁকা চালার নীচে সামাজিক আচার-বিচার নিয়ে 'সভা' বসে, 'পঞ্চজন' এসে সমবেত হন সন্ধ্যার পর। এ-ঘরখানা 'মান্য' অতিথিদের জন্য রাখা আছে, কিন্তু তেমন অতিথি আর আসে কই ?

কেনারাম বললে, ঠাকুরের মতো 'মান্য' ব্যক্তি আরও দু-চারজন এসেছিলেন বটে, কিন্তু কেউ থাকেননি। আমাদের ইচ্ছাটা এবার ব্যক্ত করি, ঠাকুর।

ব্রাহ্মণ ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,—বলো।

অন্য এক বৃদ্ধ বললে,—তার আগে তামাক ইচ্ছে করুন।

থেলো হুঁকোয় একটা নতুন কল্‌কেতে তামাক নিয়ে এতক্ষণে এল একটি মানুষ। জানা গেল, তাদের গাঁয়ে 'বমুনের হুঁকো' না থাকোয় এই বিড়ম্বনা। লোকটি দু-ক্রোশ পথ জোরে জোরে হেঁটে পাশের গাঁ থেকে বামুনের হুঁকো নিয়ে এসেছে।

—সে গাঁয়ে ব্রাহ্মণ আছে নাকি ?

কেনারাম বললে আজ্ঞে না, আশপাশ জুড়ে পাঁচ-ছটা গ্রামেও নেই। চোরচিতাতপা'য় জমিদারদের পুরুতঠাকুর একঘর আছেন বটে। তা তাঁদের কেউ এ-গাঁয়ে বসত করতে আসেননি।

ব্রাহ্মণ উঠে বসে তামাকুতে মুখ দিলেন। মনটা তাঁর অনেক প্রসন্ন করে বললেন,—চণ্ডীমণ্ডপে বেদী দেখলাম, বিগ্রহ নেই। বুঝলাম, মাটির বিগ্রহ তৈরী করে পুজো হয়, পরে তাঁর বিসর্জনও হয়ে যায়।

কী বিগ্রহ ?

কেনারাম বললে,—মা মনসা। শ্রাবণের শেষে পুজো হয়। পুজো আর কী, ব্রাহ্মণ ত কাউকে আনতে পারি না, ঐ নিজেরাই দুধকলা আর ভুজ্যি দিয়ে মনে মনে বলি, অপরাধ নিও না মা।

অন্য এক বৃদ্ধ আর থাকতে পারলো না, অনেকক্ষণ উস্‌খুস্ করবার পর অবশেষে বলে ফেললে,—এবার আমাদের নিবেদনটা শুনুন আজ্ঞে—

বলো।

বৃদ্ধকে থামিয়ে দিয়ে কেনারাম বললে কথাটা। ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে ছলছল চোখে বললে,—কৃপা করুন ঠাকুর। আপনি কৃপা করে এই গাঁয়েই বসত করুন, জমিদার মশায়ের কাছে আর্জি জানানোই আছে, বিঘে কয় ভুঁই নিষ্কর দেবেন তিনি আপনাকে। আর আমরা তো রয়েছি! আপনার ঘরদোর তুলে দেবো।

কথাটা শুনে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ।

সকলেই চুপচাপ। অসীম আগ্রহে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এই সময় উঠনের প্রান্তে যদি একটি গাছের পাতাও পড়ত, সে-শব্দটুকুও বুঝি শোনা যেতো!

ওদের নীরবতা ভেঙে গেল একটা 'ফের্‌টা' পাখীর আচম্‌কা ডাকে। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকতে ডাকতে ঘরের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল।

ব্রাহ্মণ চম্‌কে বললেন,—কী পাখী হে ?

কেনারাম বললে,—আমরা এ-দিগরে বলি 'ফেরটা' পাখী, আপনারা কী বলেন জানি না। দেখতে ছোট, কিন্তু গলার স্বর উচ্চ।

ব্রাহ্মণ বললেন,—সপ্তম সুর। চড়া নিখাদ।

ওরা কথাটা বুঝলো না। 'হাঁ' করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ব্রাহ্মণ বললেন,—প্রস্তাবটা আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও। কাল প্রাতঃকালে তোমাদের কথার উত্তর পাবে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কেনারামের মুখ। ব্রাহ্মণ যে আগেকার অতিথিদের মতো এক কথায় 'না' করে দেননি, এতেই সে খুশি। এবং একটি রাত্রিও যে তিনি এ-গ্রামে বাস করতে চেয়েছেন, তাও কম লাভের কথা নয়।

ওঁকে একা একটু বিশ্রাম করতে দিয়ে ওরা চলে গেল।

সন্ধ্যা-আহ্নিকের পর আবার ফলারের আয়োজন। ব্রাহ্মণ [illegible]তে অন্ন-স্পর্শ করেন মাত্র একবার। ফলার-শেষে ব্রাহ্মণ [illegible]ড়ে বললেন, আজ জ্যোৎস্না উঠেছে বড়ো সুন্দর। চলো, সুবর্ণরেখা দেখে আসি।

নিমেষে মশাল জ্বলে উঠলো কয়েকখানা। জনকয়েক লোকের সঙ্গে কেনারাম চললো ব্রাহ্মণকে নিয়ে 'নামপাড়া' পার হয়ে সুবর্ণরেখার বালিয়াড়িতে। দূর থেকেই দেখা যায়, জ্যোৎস্নার বিভায় বালির স্তরে স্তরে অভ্রের কুচিগুলো ঝিক্‌মিক্ করছে! বালির পর বালি—বেশ খানিকটা হাঁটার পর—নদীর শীতল ধারা পাওয়া গেল। নদীর বিস্তার মন্দ নয়। ঢেউ নেই বললেই হয়, শান্ত জল নিঃশব্দে বয়ে চলেছে।

কেনারাম বললে,—বর্ষায় এঁর রূপ দেখবেন। দুকূল ছাপিয়ে যাবেন, আর কী স্রোত! ঢল নামলে খেয়া বন্ধ হয়ে যায়।

সবাইকে বিদায় করে শুধু কেনারামকে নিয়ে অনেকক্ষণ নদীর

ধারে বসে রইলেন ব্রাহ্মণ। বললেন,—তোমাদের আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। কিন্তু এক কথায় 'থাকব' বলতে পারছি না।

আপনার কোন কষ্ট হবে না প্রভু।

—তা আমি জানি। কিন্তু তবু আমায় ভাবতে হবে। কাল প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আর কোন কথা হলো না। নিশ্চল একটা মূর্তির মতো চুপচাপ বসে রইলেন ব্রাহ্মণ। শুধু বললেন, তোমার হাতের মশালটা নিভিয়ে ফেলো।

কেনারাম শঙ্কিত হয়ে বললে,—ফিরবেন কী করে ?

ব্রাহ্মণ অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—এমন জ্যোৎস্নার আলোয় ফেরার ভয় ?

কেনারাম কথাটা বলি-বলি করেও বলতে পারলো না। জ্যোৎস্নারাত্রে এমন গ্রীষ্মের সময়—যখন ফুরফুরে বাতাস বয়—তখনি ত তাঁরা বেরিয়ে পড়েন, অনেক সময় পথের ওপরই শুয়ে থাকেন, অসাবধানে যদি কারুর পা পড়ে তাঁদের ওপর ? সর্বনাশ !

কিন্তু সে-কথা ঠাকুরকে মুখফুটে বলতে পারলো না। বললে ব্রাহ্মণ যদি অন্যদের মতো ভয় পেয়ে এখুনি চলে যেতে চান

রাত আরও গভীর হলো। ব্রাহ্মণ উঠলেন। নীরবেই বালিপথ পার হয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চললেন। তিনি সামনে, কেনারাম পিছনে। তার বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছিল। হে মা মনসা, কোন বিপদ আপদ ঘটিও না মা !

কিন্তু, প্রার্থনা জানাবার কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘটনাটা ঘটলো। এক যায়গায় বাঁক ছিল। একটা হুমড়ি খাওয়া পাথরের পাশ দিয়ে বেঁকে যেতে হয় গ্রামের মধ্যে। তা-ও মূল গাঁ নয়, ওদের 'নামপাড়া',—অর্থাৎ 'নীচের পাড়া'। ঠাকুর সবেমাত্র বাঁকের মুখে পা দিয়েছেন। আর অমনি 'ফোঁস্' করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন একেবারে ঠাকুরের মুখোমুখি। 'এই বিরাট ফণা, জিভ্‌টা লক্‌লক্ করছে, চোখ দুটো মণির মতো ঠিক্‌রে

বেরোচ্ছে! কেনারাম পরে পড়শীদের কাছে ঘটনাটার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিল,—'আমি পিছিয়ে এলাম, কিন্তু ঠাকুর পিছুলেন না। তিনি বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেই চোখের দিকে চোখ রাখলেন। আর তারপরে তোমরা বললে পেত্যয় যাবে না, তিনি 'আ—' করে অদ্ভুৎ মিষ্টি একটা সুর ধরলেন। একটানা ঐ সুর শুনলে মনে হবে, কে যেন কাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ভারী মিষ্টি সেই সুর,—শুনতে শুনতে আমারই দেহমন যেন জুড়িয়ে আসতে লাগলো। চোখ চেয়ে দেখলাম, বিরাট ফণাটা তিনি একটু পিছিয়ে নিয়ে মৃদু মৃদু দুলছেন, ঠাকুর কিন্তু একপাও পিছু হটেননি। তিনি সেই একভাবে দাঁড়িয়ে সুরের খেলা খেলে যাচ্ছেন। অমন সুর তোমরা কখনো শোনোনি। ঠাকুরের যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি সুরও খেলছে বটে সেই গলায়! দেখতে-দেখতে কী হলো জানো? ধীরে ধীরে তিনি নীচু হতে লাগলেন, ফণা নামালেন, তারপর ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে জঙ্গলের দিকে ঢুকে গেলেন।

—তারপর?

কেনারাম বলে,—আমি তখন পাগলের মতো ঠাকুরের পায়ে পড়েছি। পাগলের মতো কাঁদতে-কাঁদতে বলছি, আপনি 'নিয্যস্' মহাপুরুষ, আপনি 'নিয্যস্' মানুষ নন, দেবতা! যেই হন আপনি এ-গাঁয়ে থাকুন, যে-রূপ ধরে আপনার খুশি থাকুন, আমরা আপনার পুজো করবো।

ব্রাহ্মণ বললেন,—কিন্তু কে শুনবে আমার কথা? একটু বিরক্ত হয়েই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ভাবতে দাও।

পরদিন প্রভাত না হতেই কেনারাম ছুটে গেল মা-মনসার তলায়। ঘরের দরজা খোলা, কেউই ঘরে নেই। চীৎকার করে কেঁদে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে-গড়াতে দাওয়া থেকে উঠনে এসে পড়লো, বলতে লাগলো,—মহাপুরুষ আমাদের ফাঁকী দিয়ে চলে

গেলেন। কেন আমি তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরলাম না। কেন আমি তাঁকে রাত্রিবেলা একা থাকতে দিলাম।

কেনারামের চীৎকারে সবাই ঘুম ভেঙে একে একে ছুটে এলো, এমনকি, মেয়েরা পর্যন্ত। এসে 'হায় হায়' করতে লাগলো সকলে।

এমন সময় দেখা গেল, ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের সামনে, মাথায় ভিজে গামছা, হাতে তাঁর দ্বিতীয় গামছাটিও ভিজে।

সবিস্ময়ে তিনি বললেন,—কাঁদছো কেন? তোমাদের কী হয়েছে? নির্বাক হতভম্ব হয়ে সকলে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তাদের মন বল্‌ছে, একী আবির্ভাব, না, আগমন! উনি কী মানুষ, না মানুষ-রূপী দেবতা!

অল্প একটু হেসে ব্রাহ্মণ বললেন,—নদী থেকে স্নান করে এলাম। এস কেনারাম, ঘরে এস। আমার আহ্নিকও সারা হয়ে গেছে। কিন্তু আপাততঃ অন্য কেউ ঘরে আসবে না—তুমি একা।

তাই-ই হলো। সবাইকে বাইরে রেখে উনি কেনারামকে নিয়ে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন,—বসো।

খাটে শীতল পাটির ওপরে আসন পিঁড়ি হয়ে উনি বসলেন। কেনারাম বসলো ওঁর পায়ের কাছে, নীচে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললেন,—তোমরা আমাকে গাঁয়ে রাখতে চাও স্থায়ীভাবে, তাই না?

শুষ্ক গলায় কোনরকমে ঢোঁক গিলে কেনারাম বললে,—আজ্ঞে

উনি বললেন,—তাহলে, আমি 'থাকবো-কি-থাকবো না',—এর উত্তর পাবার আগে তোমাকে একটা কথা শুনতে হবে। সে-কথা আর কিছু নয়, আমার পরিচয়। ওড়িষ্যার রাজা কপিলেশ্বরের কাছে আমি ফিরে চলেছিলাম। সচরাচর যে-সড়কে লোকে ওড়িষ্যার দিকে যাবার জন্য চলাফেরা করে, যাবার সময় সেই সড়কে গেলেও ফেরার জন্যে এই সংক্ষিপ্ত পথই বেছে নিয়েছিলাম। কারণ, আমি চাইনি কোনো পরিচিত লোক আমাকে চিনে ফেলুক। বুঝতেই পারছ, এই পথে এসেও আত্মপরিচয় আমি কাউকে

দিতে চাইনি। কারণটা কী, শুনবে? আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু পরাজিত।

বলতে-বলতে মুখখানা নীচু করলেন তিনি। সুগৌর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে, নত চোখদুটি থেকে টপ্‌টপ্ করে দু-এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরে পড়লো।

কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র, পরক্ষণেই তিনি সামলে নিলেন নিজেকে। চোখ বুজে ওর দিকে সোজাসুজি তাকালেন, বললেন,—কী? পরাজিত ব্রাহ্মণকে গ্রামে স্থান দিতে রাজী আছ?

কেনারাম ওর মুখের দিকে অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বলল, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না প্রভু!

ব্রাহ্মণ একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললেন,—আমি সঙ্গীতসিদ্ধ মানুষ। ওড়িষ্যার মহারাজ কপিলেশ্বরের রাজসভা থেকে জয়পত্র অর্জন করেছিলাম। কিন্তু সবাই বললে, গৌড়ে যেতে পার, লক্ষ্মণাবতীতে? রাজা লক্ষ্মণসেনের জয়পত্র না প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তোমাকে 'দিগ্বিজয়ী' আখ্যা দেওয়া চলে না।

একদিন তাই রওনা হয়ে পড়লাম গৌড়ের উদ্দেশে। কোনদিকে তাকালাম না, ঘরসংসার, কোনোদিকে না। আমাকে জয়ী হতে হবে, যেমন করে হোক গৌড়েশ্বরের জয়মাল্য আমাকে লাভ করতেই হবে। মধ্যাহ্নকালে যখন গৌড়-লক্ষ্মণাবতী নগরে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেহমন শ্রান্তিতে অবসন্ন। জনৈক ব্রাহ্মণ আমাকে বিশ্রাম গৃহে নিয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নকাল তাঁর কাছে কাটিয়ে অপরাহ্ণে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ বেলা। সারাটা দিন দাবদাহ ভোগ করার পর ধরিত্রী স্নিগ্ধ হয়েছেন, ঝিরঝির হাওয়া বইছে নদীর ওপর দিয়ে। আমি নদী বলছি, কিন্তু ওরা বলেন স্বর্ণনদী বা গঙ্গা! এই গঙ্গার পশ্চিম তীরেই লক্ষ্মণাবতী নগর শোভা পাচ্ছে। বিস্তীর্ণ নগর। চিত্রপটের মতো সাজানো। আমি যেতে যেতে হঠাৎই কী এক সুরের গমক শুনে থম্‌কে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গিয়ে দেখি, গঙ্গার বুকে বিশাল-বিশাল নৌকা

সাজানো। ছোট-ছোট নৌকাও রয়েছে। সে-সব নৌকায় শিরস্ত্রাণ পরিহিত সশস্ত্র সেনাবাহিনী। লক্ষ্য করে দেখলাম, ছোট-বড়ো সব নৌকারই লক্ষ্য কেন্দ্রপতি এক সুবৃহৎ নৌকার দিকে।

পাশেই ছোট্ট একটি ঘাট, সেই ঘাটে গা-ধুতে আসছেন একে-একে অনেক স্ত্রীলোক, কাঁখে তাঁদের পিতলের ঘড়া। পড়ন্ত রোদ্দুর তার ওপর পড়ে ঝলমল করছে। ধীরে ধীরে ঘাটে নেমে যাচ্ছেন তাঁরা, কিন্তু অনতিদূরের সৈনিক পুরুষদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তাঁরা কেউ সেদিকে দৃক্‌পাতও করছেন না, একাগ্রমনে তাঁরা তাকিয়ে আছেন তাঁদের কেন্দ্রের সেই সুবৃহৎ নৌকাখানির দিকে। গৌড়বঙ্গে নানান্ আকার ও প্রকারের নৌকা আছে জানতাম, তাদের মধ্যেকার এক ময়ূরপঙ্খী ভিন্ন আর কোনো নৌকার গঠন-দৃশ্য আমার জানা ছিল না।

আশেপাশে 'ছিপ্' 'কোষা' জাতীয় নৌকার প্রাধান্যই বেশী, কিন্তু কেন্দ্রের নৌকাটির গঠন-বৈশিষ্ট অদ্ভুত! বৃহৎ এক শুভ্রকায় রাজহংস তার দু পাশের দুটি ডানা মেলে অচিরেই আকাশে উড্ডীন হবার জন্য উন্মুখ!

কিন্তু নৌকা-দৃশ্য বা সজ্জা থেকে আমার চিত্ত ক্রমশই ধাবিত হতে লাগলো নৌকার অভ্যন্তর নিঃসৃত সুরলহরীর লক্ষ্যে। কতক্ষণ যে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ চমক ভেঙে দেখি, সুর কখন স্পষ্টতর হয়ে কানে এসে বাজতে আরম্ভ করেছে আর নৌকাটিও ধীরে ধীরে গঙ্গাতটের নিকটে এসে স্থির হয়ে গেছে। নৌকার সম্মুখভাগ একটু তির্যক্‌ভাবে দেখা যাচ্ছে, আর তার পদে সংলগ্ন হয়ে কতকগুলি সাধারণ নৌকা পর পর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তটরেখা পর্যন্ত। দেখতে-দেখতে তার ওপর কাষ্ঠখণ্ড সাজান হতে লাগলো। একের পর এক। বোঝা গেল, নৌকা থেকে তীরে হেঁটে আসবার জন্যে এই অবস্থা অবলম্বিত হল। দুজন সৈনিক লম্ফ দিয়ে তীরে নেমে পথরেখার দুপাশে দণ্ডায়মান।

আশ্চর্য হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিলাম, যদিও মন সমধিক

আকৃষ্ট ছিল সঙ্গীত-তরঙ্গের দিকে। ততক্ষণে বুঝতে বাধা ছিল না যে, সুরছন্দ যাঁর সুমধুর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল, অবশ্যই তিনি কোনো রমনী।

আমার গন্তব্যস্থল ছিল রাজসভা, কিন্তু পথিমধ্যে শ্রুত এই সঙ্গীত-ধ্বনিই আমাকে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলো।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই আছি, হঠাৎ চোখে পড়লো নৌকা থেকে নেমে আসছেন একজন মধ্যবয়সী পুরুষ, পরনে সম্পূর্ণ শুভ্রবাস, ঊর্ধ্বাঙ্গে অর্দ্ধ মির্জাই, নিম্নাঙ্গে ধবধবে ধুতি, স্কন্ধে শুভ্র চাদর, হাতে সাদা-কাপড়ে মোড়া পুঁথি-সদৃশ কোন বস্তু, অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত মুখাবয়ব,—একটা অদ্ভুত শান্ত আর সৌম্য শ্রী ফুটে রয়েছে সে মুখে। সৈন্যদ্বয় শশব্যস্তে ভঙ্গী পরিবর্তন করে ব্যাকেটিক সম্মান জানালো, কিন্তু তাঁর সেদিকে মনোযোগ নেই, আপন মনে যেন ভাবতে-ভাবতে পথের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

আমি কথা বলে তাঁর অন্যমনস্কতা ভাঙাবো-কি-ভাঙাবো না, ভাবতে-ভাবতে তিনিই সম্ভাষণ জানালেন সর্বাগ্রে। একেবারে কাছে এসে পড়ে হয়ত তাঁর চমক ভাঙলো, তারপরে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে উত্তরীয়র নিম্নে উপবীত লক্ষ্য করে করযোড়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন,—মনে হচ্ছে আপনি ব্রাহ্মণ, প্রণাম গ্রহণ করুন।

বলে উঠলাম,—স্বস্তি।

তারপরে প্রশ্ন করলাম,—মহাশয়ের পরিচয় জানতে পারি কী? আমি এ-অঞ্চলে নবাগত।

সবিনয়ে তিনি বললেন,—আমি সামান্য মানুষ, শুষ্ক তালিপত্র মসীলিপ্ত করাই আমার কর্ম।

ভাষাভঙ্গীতে গৌড়ীয় সরসতাই প্রকাশ পেলো। বুঝলাম, ইনি পুঁথিলেখক। তালপত্র বিশুষ্ক করে পুঁথির পত্র প্রস্তুত হয়, তাতে

উনি অক্ষর রচনা করে থাকেন। এবং সেই অক্ষর-রচনাকেই ইনি গৌড়ীয় ভঙ্গীতে বলছেন, মসীলিপ্ত করা।

ওদিকে সঙ্গীতধ্বনি তখন আরও বিস্তার লাভ করেছে। সেদিকে মন টানলেও এঁর সঙ্গে কথোপকথন না করে পারলাম না।

বললাম,—সদাশয় ব্যক্তির সঙ্গলাভ করে ধন্য।

'সদাশয়' বলায় উনি আবার হাতদুটি একত্র করে বিনীত অভিবাদনের ভঙ্গী করলেন। বললেন,—অপরাধী করবেন না, আমি জাতিতে তন্তুবায়।

রীতি অনুসারে আমি বললাম,—কল্যাণ হোক।

কিন্তু মনে মনে চমৎকৃত হলাম। জাতিতে তন্তুবায় বলে পরিচিত করছেন নিজেকে অথচ ইনি পুঁথি-লেখক,—ব্যাপারটায় অভিনবত্ব ছিল বৈকি।

সৌজন্যসূচক প্রশ্ন করলাম,—কী বিষয়ে আপনি লিপ্ত, জানতে পারি কি? আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল, ইনি কী ধরনের পুঁথি লেখেন তাই জানা। জ্যোতিষ, না, ব্যাকরণ, না কাব্য?

বিনীত ভঙ্গীতে তিনি বললেন,—বিষয় সামান্য। অক্ষরের সাহায্যে রসাত্মক বাক্য প্রস্তুত করা।

যুগপৎ বিস্ময় ও সম্ভ্রমের সঙ্গে বলে উঠলাম,—আপনি কবি!

কাব্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে 'রসাত্মক বাক্য',—এটা জানা ছিল বলেই ওঁর কথার ভাব ধরা আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল।

দেখলাম ওঁর চক্ষু দুটি মুহূর্তের জন্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, তারপরে এগিয়ে এসে হঠাৎ নীচু হয়ে আমার চরণ-সন্নিকটের ভূমি-স্পর্শ করে আমাকে ব্রাহ্মণ-রূপে সম্মান জানালেন, বললেন,—একজন সুপণ্ডিত রসজ্ঞ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে সার্থক হলাম।

বললাম,—স্বস্তি। কবির নামটি এবার জানতে পারি কী?

তেমনি বিনীত ভঙ্গীতেই বললেন,—বিখ্যাত নই, যাঁরা জানেন তাঁরা কেউ বলেন ধোয়ীক, কেউ বলেন ধোয়ী।

বলতে সংকোচ হয়, আমার সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি কম। বিশেষতঃ

আধুনিক গৌড়ীয় সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা বিরাজ করছেন, আমার জানা নেই।

কিন্তু পণ্ডিত না হয়েও পাণ্ডিত্যের অভিমান তখনো পুরোপুরি বিদ্যমান। তাই বিজ্ঞের ধরনে বলে উঠলাম,—আপনার কিছু কিছু শ্লোক আমি শ্রুত হয়েছি মনে হচ্ছে। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

উনি নত হয়ে ফের অভিবাদন জানালেন।

আমি স্বস্তিবাচন উল্লেখ করে সৌজন্যসূচক উক্তি করলাম—সম্প্রতি আপনি কী কাব্যরচনায় ব্যাপৃত?

সবিনয়ে হাতের সেই সাদা চাদর-ঢাকা পুঁথিখানি আন্দোলিত করে বলে উঠলেন,—'পবনদূত' কাব্য।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি। উনি আপন কাব্যের নামোল্লেখ করেই একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন,—নৌকায় বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মনটা কাব্য রচনার অনুকূলে ল এল। সম্ভবতঃ শশিকলার সঙ্গীতই এজন্যে দায়ী।

ঠিক সেই সময় নৌকা থেকে একযোগে 'সাধু-সাধু' রব উঠলো, রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতোচ্ছ্বাসও স্তব্ধ হল।

কবি বললেন,—এবার শুরু হবে বিদ্যুৎপ্রভার গীতিধারা, আমাকে বিদায় দিন ঠাকুর। ওঁর গান কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে আর নড়তে পারব না।

নিজে সঙ্গীত-সাধক, তার ওপর সঙ্গীত-শিল্পীর উল্লেখে স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। বললাম,—কে এই বিদ্যুৎপ্রভা?

ধোয়ী বললেন,—আমাদের এই নগরের শ্রেষ্ঠ নট গাঙ্গোক। তাঁর নাম শুনেছেন?

—না।

উনি বললেন—এখন তিনি প্রবীণ বয়স্ক, কিন্তু তাঁর শিল্প-ক্ষমতার তুলনা হয় না। তাঁর পুত্রবধূ হচ্ছেন ঐ বিদ্যুৎপ্রভা। ওঁর গান

শুনে এক বেনে-বউ আত্মহারা হয়ে কুয়োতে দড়ি বেঁধে কলসী নামাবার বদলে নিজের শিশুপুত্রকে নামিয়ে দিয়েছিল।

আরও উৎসুক হয়ে উঠলাম, বললাম—তাহলে ত শুনতে হয় তাঁর গান?

ধোয়ী বললেন,—যান না চলে? আপনি ব্রাহ্মণ, আত্মপরিচয় দান করুন, কেউ বাধা দেবে না।

আমি বললাম,—কিন্তু আমি যে রাজদর্শনপ্রার্থী। তাঁর সভাতেই আগে যেতে চাই।

ধোয়ী সবিস্ময়ে মুখ তুলে আমার মুখের দিকে পুরোপুরি তাকালেন, বললেন,—প্রবীণ রাজা লক্ষ্মণসেন?

—হ্যাঁ—

ধোয়ী বললেন,—তিনিই ত বান্ধব-সমভিব্যবহারে নৌকায় অবস্থান করছেন। মহামন্ত্রী পণ্ডিতাগ্রগণ্য হলায়ুধ মিশ্র আছেন, সেখ্ জালালুদ্দিন তব্রিজ আছেন, তিনিও সুপণ্ডিত ও রসজ্ঞ ব্যক্তি। আমিই শুধু রসভঙ্গ করে চলে এলাম রাজার অনুমতি ভিক্ষা করে।

ততক্ষণে নৌকার দিকে মুখ ফিরিয়েছি। আনন্দ, বিস্ময় প্রভৃতি নানারূপ ভাবের প্রতিক্রিয়া তখন আমাকে স্তব্ধবাক্ করে দিয়েছে।

উনি পুনরায় প্রণাম জানিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে কথা বলে উঠলাম। বহু প্রশ্ন মনের মধ্যে যুগপৎ আলোড়িত হয়ে উঠলেও বলে ফেললাম একটামাত্র কথা, তা-ও ভিন্ন প্রসঙ্গের। বললাম,—এ ধরনের নৌকা কখনো দেখিনি। এর নাম কী?

—হংসপদিকা।

বলে আর দাঁড়ালেন না কবি, দ্রুত পদসঞ্চারে প্রস্থান করলেন ভিন্নদিকে। ধীরে ধীরে নৌকার সন্নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সৈনিকদ্বয় ব্রাহ্মণ দেখে সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করল,—আপনি কে?

উত্তর দেবার আগে কবির কথা হঠাৎ মনে হলো। এতো কথা বললেন কবি, কিন্তু আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন না। নূতন কাব্য-

রচনার আবেগ-মুহূর্তে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই বোধহয় কবি-স্বভাব।

বললাম,—রাজদর্শনপ্রার্থী আমি এক সঙ্গীতসাধক ব্রাহ্মণ। ওড্রৱাজেশ্বর শ্রীযুক্ত কপিলেশ্বর রাজাধিরাজের জয়পত্র অর্জন করেছি আমি, গায়ক শ্রেষ্ঠ হয়েছি। এবার জয় করতে চাই গৌড়-বঙ্গ। যাও, সংবাদ দাও।

একজন সৈনিক তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে নৌকার অগ্রভাগে গেল, সেখানকার প্রতীক্ষমান সৈনিককে কী যেন বললো কাণে-কাণে। সেই সৈনিক মুহূর্তে অদৃশ্য হ'ল নৌকোর অভ্যন্তরে, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো। তার সঙ্গে এলেন জনৈক অভিজাত মুসলমান ভদ্রলোক। আন্দাজে বুঝলাম,—ইনিই সুপণ্ডিত জালালুদ্দিন তব্রিজ। তিনি দু'বাহু এগিয়ে দিয়ে সম্ভাষণ জানাতে জানাতে আমার নিকটবর্তী হলেন, বললেন,—আপনিই কী দিগ্বিজয়ী সঙ্গীতসাধক শ্রীযুক্ত বুঢ়ণ মিশ্র?

বললাম,—হ্যাঁ। সম্ভবতঃ আমি সেখ্ জালালুদ্দিন তব্রিজের সঙ্গে কথা বল্‌ছি?

—জী হ্যাঁ, বলে আমাকে নিয়ে চললেন ভেতরে, বললেন,—আসুন, মহারাজ আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

ভেতরে রাজকীয় কক্ষটি সুস্নিগ্ধ ধূপগন্ধে ভরে উঠেছে। ক্ষুদ্রকায় সারি সারি সব গবাক্ষ পথ দিয়ে গোধূলির আরক্তিম আভা এসে পড়েছে।

সমস্ত সম্ভাষণাদি সমাপ্ত হবার পর আসন গ্রহণ করে চারদিকে দৃষ্টিপাত করছি, দেখি, জনৈক বিণাবাদিনী আনত মুখে বীণার তারে মৃদু ঝংকার তুলছেন। তাঁর পাশে আরও একটি তরুণী। সম্ভবতঃ এঁরাই গায়িকা, একজন শশীকলা, অন্যজন বিদ্যুৎপ্রভা।

রাজসন্নিধানে করঙ্কবাহিকা বসে আছে, শিয়রের কাছে চামরধারিণী। আর অন্যদিকে বসে আছেন মহামন্ত্রী পণ্ডিতাগ্রণ্য হলায়ুধ মিশ্র, তাঁর পাশে শেখ সাহেব, এবং আরও অনেকে। একটি আসন

শূন্য, সম্ভবতঃ কবি ধোয়ী যে আসন ত্যাগ করে হঠাৎ-ই চলে গেছেন, এটি সেই আসন।

আমার আগমনের উদ্দেশ্য রাজসন্নিধানে নিবেদন করলাম।

মহারাজ বললেন,—অতদূর থেকে এসেছেন, অগ্রে আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন, নিশ্চয় আপনি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর?

বললাম,—না মহারাজ, নগর প্রবেশ করেই আমি সে সব সেরে নিয়েছি জনৈক ব্রাহ্মণের কুটিরে। আমার চিত্ত ব্যাকুল আপনার কাছে সঙ্গীত পরিবেশন করতে। সমাগত বুধমণ্ডলীর সঙ্গে আপনি গ্রহরাজসদৃশ হয়ে বিরাজ করছেন। এমন সুযোগ ও সুমুহূর্ত আমি কোথায় পাব? আমার মানস-পিপাসা বরং আপনি বিদূরিত করুন মহারাজ।

মহারাজ সম্মত হলেন। আয়োজন হতে লাগলো। আমি বললাম,—প্রতিযোগিতায় সবাইকে আমি আহ্বান করছি। কে আছেন আপনার সভায় গায়ক?

মহারাজ দৃক্‌পাত করলেন বীণাবাদিনীর দিকে। সেখসাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন,—ইনি বিদ্যুৎপ্রভা। আর ওঁর পাশে যিনি বসে আছেন, তিনি শশীকলা।

তরুণীদ্বয় আনত হয়ে আমাকে প্রণাম জানালেন।

বললাম,—স্বস্তি। শুরু করো তোমাদের সঙ্গীত।

তরুণীদ্বয় স্বীকৃত হ'ল না। বিদ্যুৎপ্রভা মৃদুকণ্ঠে বললেন,—আপনি থাকতে আমরা শুরু করতে পারি না।

—তথাস্তু। আমিই শুরু কর্‌ছি।

সহযোগী যন্ত্র টেনে নিয়ে সুর বাঁধলাম নিজের মতো করে। সেখ প্রশ্ন করলেন,—আপনি কোন্ রাগ বা রাগিনীতে সিদ্ধ।

উত্তর করলাম—পটমঞ্জরী।

গবাক্ষগুলি পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া হয়েছিল, তার ফলে কক্ষখানি দিনান্তের কিরণস্পর্শে স্নিগ্ধ আলোয় ভরে উঠেছিল। আমি সঙ্গীত

আরম্ভ করবার পূর্বে নিবেদন করেছিলাম,—পটমঞ্জরী রাগিণীর সময় এ নয়। সুতরাং আমার পক্ষে এ সঙ্গীত শুরু করা রীতি বিরুদ্ধ। তবে দেবাজ্ঞা ও রাজাজ্ঞায় এ-নিয়মের ব্যতিক্রম করা যেতে পারে, শাস্ত্রে নির্দেশ আছে। আপনি অনুমতি করুন রাজাধিরাজ।

মহারাজ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হলায়ুধ মিশ্রের অনুমতি নিয়ে আমাকে সুরারম্ভের নির্দেশ দিতেই মুক্তকণ্ঠে সিদ্ধরাগিণীর উদ্বোধন করলাম।

সে আমার ধ্যানস্থ কালের কথা, তন্ময় মুহূর্তগুলির কথা। আমি সুর ও শব্দব্রহ্মের সাহায্যে শ্রোতাদের মানসলোকে প্রথমেই এক চিত্রকল্পের স্থাপনা করলাম।

বিরহিণী নায়িকা কান্তবিরহে শীর্ণা হয়েছেন, কিন্তু কান্তবিস্মরণ হননি বলে দেহবর্ণ স্বর্ণদ্যুতির থেকেও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অন্তর প্রেমে উদ্বেলিত বলে দেহেও তার সৌন্দর্য বিভা বিস্তার করেছে। অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তাকে ঘিরে, দয়িতের সুখ-স্মৃতি যেন লাবণ্য হয়ে জড়িয়ে রয়েছে সারা দেহ। মেঘপুঞ্জের মতো উদ্বেল কেশরাশিকে তিনি বেণীর শাসনে সংযত করে রেখেছেন। দয়িত তখনো আসছেন না দেখে ভিতরে ভিতরে নিদারুণ চঞ্চল হলেও বাইরে তার প্রকাশ নেই। উন্মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়ে সতৃষ্ণ নয়নে পথের ওপর দৃষ্টি মেলে দিয়েছেন। সারা দেহমনপ্রাণ তাঁর প্রিয়তমের প্রতীক্ষা-কাতর।

চিত্রকল্প থেকে ধীরে ধীরে আরও গভীরে প্রবেশ করতে লাগলাম। একটি প্রদীপ-শিখা থেকে আরেকটি প্রদীপ-শিখা জ্বালিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় প্রদীপটিকে যেন কক্ষান্তরে নিয়ে যাওয়া হলো। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু দুটি প্রদীপের শিখাই থরোথর করে কাঁপতে লাগলো। কোথায় গেল আমার দ্বিতীয় সত্ত্বা, এখনো কেন ফিরে আসছে না সে, এখনো কেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে না আমার মধ্যে? সে এলেই আমার অধীরতার সমাপ্তি, তার পূর্বপর্যন্ত আমার চির-বিরহ!

সঙ্গীতের পরবর্তী পর্যায়ে আর চিত্রকলাও নেই, প্রতীকও নেই;

এখন শুধু অনুভূতির গভীরে অবগাহন। কয়েকটি ছুর্বোধ্য শব্দের উচ্চারণ আর শ্রোতাদের অন্তরলোকে ভাবসৃষ্টি। পুরুষ প্রকৃতির বিরহ এখন শুদ্ধ-চৈতন্যের চির-বিরহে পর্যবসিত। মহাবিশ্বে তুমি যে বিচ্ছিন্ন একটি শিখামাত্র, ছুঃসহ নিঃসঙ্গতায় থরো থরো কম্পিত হচ্ছে, এ ছাড়া আর যেন কোন অনুভূতি তোমার না থাকে!

আমি সঙ্গীত শেষ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে সম্মিলিত কণ্ঠের এক অস্ফুট ধ্বনি যেন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো। ভিতরে সভা নিস্তব্ধ, সবাই আমার দিকে চিত্রাপিতের মতন তাকিয়ে আছেন, তরুণীরাও সব ভুলে বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছেন। অন্ধকার নেমে আসছে, সারি সারি বৃহৎ ঘৃত প্রদীপগুলি অপেক্ষমান, তাদের বুকে তখনো শিখা জ্বলে ওঠেনি।

বাইরের অস্ফুট চীৎকারে সবাই যেন একটু কেঁপে উঠলেন, কিন্তু কেউ কোন কথা বললেন না। জনৈক সৈনিকপুরুষ ছুটে ভিতরে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন,—গবাক্ষপথে তাকিয়ে দেখুন মহাবাজ, নদীতীরের পিপ্পলবৃক্ষে আর একটি পত্র নেই, সমস্ত ঝরে পড়েছে!

অবাক হয়ো না, শব্দ ব্রহ্ম এ শক্তি অবশ্যই রাখে। যথার্থ ধ্বনি প্রক্ষেপে এটা করা সম্ভব, এর মধ্যে কোন যাছবিদ্যা নেই।

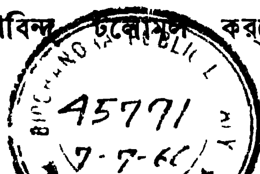
সবাই গবাক্ষপথে গিয়ে দেখলেন, সৈনিকপুরুষের উক্তি মিথ্যা নয়! মহারাজও দেখলেন, বলে উঠলেন,—সাধু-সাধু!

সভাকক্ষের সবাই তখন রাজকণ্ঠের প্রতিধ্বনি করলেন,—সাধু-সাধু!

সেখ তখন শশিকলা-বিছ্যুৎপ্রভাদের দিকে তাকালেন। বললেন,—এবার তোমরা শুরু করো।

কিন্তু শশিকলা আভূমি মস্তক লুটিয়ে আমাকে প্রণাম জানিয়ে বললে,—হার মানলাম প্রভু।

বিছ্যুৎপ্রভার ছুটি চোখে জল। করঙ্কবাহিকা উঠে প্রদীপগুলি একে একে সব প্রজ্বলিত করে দিল। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, তার অক্ষিতটে মুক্তাবিন্দু টলোমল করছে। সে অকস্মাৎ



দু'হাতে মুখ ঢেকে অশ্রুনিঃসৃত কণ্ঠে বলে উঠল,—আমি ও পারবো না প্রভু।

মহারাজ সোজা হয়ে বসলেন। তারপরে কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে আমার কাছে এলেন। কণ্ঠের বহুমূল্য রত্নহার মোচন করে আমার কণ্ঠে দুলিয়ে দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় বাইরে থেকে তীব্র উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—থামুন মহারাজ।

মহারাজ চমকে তাকালেন দরজার দিকে। আমিও তাকালাম। সদ্যস্নাতা এক অনিন্দ্যসুন্দর রমনীমূর্তি। দীর্ঘকায়া, পদ্মপলাশ-লোচনা, দিব্যকান্তি। দক্ষিণ বাহু একটি জলপূর্ণ কলসকে বেষ্টন করে রয়েছে, পরনের শাড়ীটি সিক্ত হয়ে সেই স্বর্ণ প্রতিমার অঙ্গে নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে! রমণীর তাতে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, তার চোখ দুটিতে যেন ক্রীড়া করছে বিচ্ছুরিত বহ্নি, গ্রীবাভঙ্গীতে এক মনোরম দৃপ্তভাব।

রমণী বললেন,—আমি কোলাহল শুনেছি জনতার। শুনেছি আপনাদের 'সাধু-সাধু' রব, কিন্তু রাজপুরস্কার ত ব্রাহ্মণের পক্ষে এখনো লভ্য হয়নি। তাঁর বিজয় ঘোষিত হ'ল কখন? আমাকে বা আমার স্বামীকে পরাস্ত না করে উনি এই পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেন না।

রাজা বললেন,—বেশ। আমরা অপেক্ষা করছি, আপনার স্বামীকে ডেকে আনুন।

রমণী বললেন,—আমি থাকতে তিনি কেন? আগে আমাকে উনি পরাভূত করুন, তারপরে আমার স্বামী।

রাজা বললেন,—আচ্ছা, তাই হোক। আপনি আপাততঃ গৃহে যান, জলপূর্ণ ঘট পূর্বে রক্ষা করে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে তারপর চলে আসুন। আমরা অপেক্ষা করছি। রমণী শুনলেন না সে-কথা, জলপূর্ণ কলসীটি একধারে সন্তর্পণে রেখে ঐ সিক্ত বসনেই বসে পড়লেন অদূরে। রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে।

রাজা ফিরে গিয়ে আসন-গ্রহণ করতেই রমণী বলে উঠলেন,—

আজ্ঞা দিন, শুরু করি। বিজয়িনী না হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবো না।

অবাক হয়ে আমি সেই পদ্মিনী নারীকে দেখছিলাম। এমনি ব্যক্তিত্বের মাধুর্য, যে স্বয়ং রাজা পর্যন্ত ওঁর আচরণে বিরক্ত হতে পারলেন না। রমণী বীণাসহযোগে শুরু করলেন সঙ্গীত। একাগ্র মনে ধ্যানস্থ চিত্তে যেন সুরজগতে অবগাহন করলেন। শোনা মাত্রই বুঝতে পারলাম, রমণী আলাপ করছেন—গান্ধার রাগ।

স্বর-লয়-তাল বড়ো সূক্ষ্ম পর্দায় লীলা করে বেড়াতে লাগল। কণ্ঠস্বরও অতীব মিষ্ট। কিছুক্ষণের জন্য আমিও যেন সমস্ত বিস্মৃত হলাম,—আমি কে, কোথায় এসেছি, কী জন্য এসেছি,—সব।

এঁরও গীতশেষে বহির্মণ্ডলে একটা কলরব উঠল। এবারও ছুটে এলো এক সৈনিকপুরুষ,—গঙ্গাবক্ষের চলমান সব নৌকা আপনা আপনি এসে এখানে জড়ো হয়েছে সুরের টানে।

সবার সঙ্গে আমিও উঠে দেখলাম, রাজাও দেখলেন।

আরম্ভ হলো বিচার। কেউ বললেন, গায়িকাই শ্রেষ্ঠ, কারণ নির্জীব নৌকা সচল হয়েছে এটাই আশ্চর্যের কথা, বৃক্ষপত্র ত সজীব।

বলে উঠলাম—এ-বিচার গ্রাহ্য নয় আর তা'ছাড়া, অপরিচিতা এই রমণীর সঙ্গে আমার আবার প্রতিযোগিতা কিসের? গৌড়বঙ্গে কি পুরুষ নেই?

সেখ বললেন,—রমণী অপরিচিতা নন, বিশেষরূপে প্রখ্যাতা।

নট গাঙ্গেকে বললেন,—ইনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের দেবদাসী ছিলেন। দৈব নির্দেশে ব্রাহ্মণ-কবির সহধর্মিণী হয়েছেন। এঁর নাম,—পদ্মাবতী।

বললাম তা হবে। কিন্তু আমি পুরুষ প্রতিযোগী চাই।

পদ্মাবতী বললেন,—আমার স্বামীকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

হয়ত কোন সৈনিককেই পাঠানো হতো, শশিকলা উঠে বললেন, মহারাজ যদি অনুমতি করেন, আমি ডেকে আনছি কবিকে। বেশি দূরে ত নয়, এখুনি আসবেন।

রাজ-অনুমতি নিয়ে শশীকলা চঞ্চল পায়ে ছুটে চলে গেলেন।

সবিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করলাম,—যিনি আসছেন, তিনি শুনছি 'কবি', তাঁর নাম জানতে পারি কি?

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নিজে উত্তর দিলেন এ-কথার। বললেন,—জয়দেব।

আত্মসমাহিত পুরুষ এই কবি জয়দেব। তাছাড়া, যেমন সুমধুর কণ্ঠ, তেমনি সূক্ষ্ম ও উচ্চাবচ সুরবিস্তারের প্রতিভা। উনি ধরলেন বসন্ত রাগ, আর তারই ফলে নিষ্পত্র বৃক্ষ আবার পত্রশোভিত হয়ে উঠল।

শেখ আমাকে প্রশ্ন করলেন,—এটা কি আপনি পারতেন?

ক্ষুণ্ণস্বরে বলে উঠলাম,—না।

ওঁরা তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। বৃক্ষপত্র ঝরিয়ে দেওয়া বরং সোজা, কিন্তু বৃক্ষে নবপত্র গজিয়ে ওঠা সত্যিই বিস্ময়কর।

অতএব, জয়দেবই বিজয়ী সাব্যস্ত হলেন।

রত্নালঙ্কার কণ্ঠে নিয়ে কবি উঠে দাঁড়াতেই চারদিকে 'ধন্য-ধন্য' রব উঠলো। আমি পরাজিত হয়েছি, গর্ব আমার চূর্ণ হয়েছে,—এতে আমার বেদনা অপরিসীম সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু মনে সান্ত্বনা পেলাম এই ভেবে, যে যোগ্যের কাছে আমি পরাভূত।

সেদিন সভাশেষে যখন সবাই গৃহাভিমুখী, জয়দেব আমাকে নিদারুণ পরাজিত করলেন ঠিক তখনি। হঠাৎ আমাকে ধরে আমার কণ্ঠে দুলিয়ে দিলেন রাজ-রত্নহার। বললেন,—রত্নে আমার প্রয়োজন নেই, আপনি নিয়ে যান দয়া করে, আপনার প্রয়োজনে লাগতে পারে।

অবাক হয়ে কবির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ।

উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম, এর অর্থ কি জানেন? আমি যেখানে যাবো এটা দেখিয়ে বলবো, আমিই বিজয়ী। অমন যে গৌড়-বঙ্গ

যেখানে গোড়কাব জয়দেবের আবাস-স্থল, সেখান থেকেও আমি এসেছি জয়লাভ করে।

জয়দেব তেমনি হাসতে হাসতেই বললেন,—বেশ ত, তা-ই করবেন। ক্ষতি কী?—

ক্ষতি নেই!—সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, এতে এই কথাই কি অবশেষে রটে যাবে না যে, বুঢ়ন মিশ্রের কাছে জয়দেব পরাজিত?

জয়দেব হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত টেনে নিলেন, বললেন, —এমন একটা সময় আসে, যখন মানুষের কাছে জয়-পরাজয় সমান হয়ে দাঁড়ায়। আমার জীবনে সেই স্বর্ণমুহূর্তকাল সমাগত, আশীর্বাদ করুন যেন সাফল্যলাভ করতে পারি।

—কিন্তু, যশ? সেখানে যে মিথ্যা কলঙ্করেখা পড়বে?

জয়দেব বললেন,—যশ-মান এসব কিছুই কবির নয়। কবির কাম্য তার রচনার সার্থকতা। আশীর্বাদ করুন, যেন পরম সত্যকে রচনায় পূর্ণ প্রতিফলিত করতে পারি।

ওঁর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মুহূর্তে প্রশ্ন করেছিলাম,—কী রচনায় আপনি এখন ব্যাপৃত, কবি?

জয়দেব বলেছিলেন—বহুদিন থেকেই বিশেষ একটি কবি-কর্মে নিয়োজিত আছি, এখনো শেষ হচ্ছে না। মনে নিদারুণ অস্থিরতা।

—কেন?

উত্তর দিয়েছিলেন,—সংশয়। ঠিক পথে চলছি ত? জ্ঞানমার্গ নয়, এমনকি ভক্তিমার্গও নয়, বিশুদ্ধ রসমার্গ। যা ভক্তিরও ওপরে। আশীর্বাদ করুন, যেন অচিরাৎ আমার 'মুগ্ধমাধব' শীর্ষক দশম সর্গ সমাপ্ত হয়।

বলেছিলাম,—স্বাস্ত। কিন্তু আপনার কাব্যের নাম?

—গীতগোবিন্দম্।

· রাজ রত্নালঙ্কার আমি সত্যিসত্যিই বহন করে আনতে পারিনি।

পরবর্তী প্রত্যুষে ধোয়ী কবিকে খুঁজে বার করে তাঁর হাতে অলঙ্কার দিয়ে এসেছি, বলে এসেছি, জয়দেবের হাতে এটি দিয়ে দেবেন।

তিনি স্পষ্ট করে কিছু বোঝবার আগেই আমি ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম। আমি জানি শিল্পীর পথে রাজ-জয়টিকার মূল্য কতখানি। গৌড়বঙ্গের জয়পত্র সঙ্গে থাকলে যে-কোন প্রদেশে আমার সমাদর হতো। আমি যশ পেতাম, মান পেতাম, অর্থ পেতাম, এক কথায় মানুষের যা কাম্য, তাই-ই পেতাম।

কিন্তু সব আমি ইচ্ছা করেই ফেলে এসেছি, ভাই। না ফেললে আমার মনের অবস্থা কেমন হতো, ভেবে দেখ ত? জাগতিক সুখের সব-কিছু পেয়েও আমি রিক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমার সাধনা আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতো, আমার প্রশান্তি কোথায় পালাতো কে জানে, দিনরাত বিনিদ্র রজনী যাপন করতাম, আর লোকের মিথ্যা অভিনন্দন কুড়িয়ে জীবন কাটাতাম। ভাবতে পারো সে দুর্দশার কথা? শিষ্যদলবেষ্টিত হয়ে মধ্যমণি আচার্যের মতো বিরাজ করতাম, তারা এসে এক নিষ্প্রাণ কঙ্কালকে প্রণতি জানাতো, যার দেবার কিছু নেই, সৃষ্টি করবারও কিছু নেই।

অথচ, ফেলে এসেও আমার স্বস্তি নেই। আমি কোন্ মুখে দেশে ফিরবো? কোন্ মুখে আমাদের মহারাজের সভায় গিয়ে দাঁড়াবো? কোন্ মুখে স্ত্রীপুত্রের সামনে গিয়ে দেখা দেবো? পরাজিত শিল্পীর বেদনা যে কী, সে আমি কেমন করে তোমাকে বোঝাবো বলো? এ-আমার অন্তরের ক্ষেত্রে পরাজয় নয়, এ-আমার জাগতিক ক্ষেত্রে পরাজয়। এর ফল আরও অমানুষিক। আমি সঙ্গীত পরিবেশন করতে যাবো, লোকে মনে মনে হাসবে, ঘৃণা করবে, তাচ্ছিল্য করবে, বলবে, এ-লোকটা হেরে এসেছে। এর গান আবার শুনবো কী?

তাই, যখন তোমাদের গাঁয়ের ঐ বটচ্ছায়ায় বসে শ্রান্তি অপনোদন করছিলাম, তখন মনে মনে এ-চিন্তাও আসছিল যে, কী হবে এ-জীবন রেখে? এ-জীবন বিসর্জন দেই!

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তুমি এসে ডাকলে।

এখন বলো, সব শুনেও কি তুমি আমাকে তোমার গাঁয়ে স্থান দিতে চাও ?

কেনারাম ব্রাহ্মণের মুখের দিকে 'হাঁ' করে তাকিয়ে রইলো।

আটশো বছর আগেকার কথা, তখন গ্রামে যারা নিরক্ষর, তারাও শক্ত বাঙলা বললে বুঝতে পারতো। বিশেষ করে যারা মোড়ল, তারা ত বটেই। এ-কাজে সে-কাজে তারা গ্রামান্তরে যায়, নানান্ লোকের সঙ্গে মেশে। ফলে, কথোপকথনে শিক্ষিতদের মতো ঠিক দড় না হলেও আন্দাজে-আন্দাজে বুঝতে ঠিকই পারে।

কেনারামও বুঝেছিল ব্রাহ্মণের সব কথা। তাঁর আপন অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা সম্যক না বুঝলেও কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল। অজ্ঞাত সাধারণ ব্রাহ্মণ হলে কোনো কথা উঠতো না, যেহেতু ইনি কিঞ্চিৎ খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠাবান, সেইহেতু এঁকে নিয়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে কিছুটা কানাকানি হবার আশঙ্কা আছে। তাতে তাদের অবশ্য কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণের স্পর্শকাতর মনে ব্যথা লাগতে পারে।

কিন্তু সে-সব দেখা যাবে পরে, আপাততঃ ওসব চিন্তা করবার দরকার নেই। আর তাছাড়া, কাল রাত্রের ঘটনা মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে আরও চমৎকারিত্ব অর্জন করবে। সেই পল্লবিত কাহিনীই কি ওঁর পরাজয় সংবাদকে ভুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?

কেনারাম বললে,—ঠাকুর, আর কিছু জানিনা, আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের গাঁয়ে থেকে আমাদের কল্যাণ করুন।

বুঢ়ন মিশ্র তৎক্ষণাৎ বললেন,—আমি কথা দিচ্ছি, থাকবো। কিন্তু একটি সর্তে। আমার প্রকৃত পরিচয় কাউকে দিতে পারবে না। কেউ যেন জানতে না পারে, মহারাজ কপিলেশ্বরের দেওয়া জয়পত্র শিরে যার শোভা পেয়েছিল, সেই বুঢ়ণ মিশ্র এই আমি। আজ থেকে শুরু হবে আমার অজ্ঞাতবাস। আজ থেকে নূতন নাম নিলাম আমি,—বিশ্বম্ভর মিশ্র।

ব্রাহ্মণ সেই থেকে প্রায় বছরখানেক রইলেন গাঁয়ের এই 'জাগুলী' বা 'মা-মনসা'র থানে,—সেই ঘরখানিতে। গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বম্ভর মিশ্রের খ্যাতি। উদ্যত ফণা, ক্রুদ্ধ সর্পকেও বশ করতে পারেন যিনি, তাঁকে দেখতে তাঁকে প্রণাম করতে সেই আটশো বছর আগেকার গ্রামীণ সমাজ এসে ভেঙে না পড়বেই বা কেন? তিনি যে সঙ্গীতের সাহায্যে সর্পকে জয় করেছিলেন, একথা রটলো না, রটলো তিনি সর্পের কানে কানে কী মন্ত্র যেন পড়ে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত মন্ত্র, সে কী ব্যর্থ হতে পারে?

শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে, তিনি নিজে ও-কথার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু কে শুনবে? কে বিশ্বাস করবে? লোকে ভাবলো,—গুণী ব্যক্তি। ভস্ম দিয়ে ঢেকে রাখা আগুন। ওঁরা কি মুখে কিছু স্বীকার পান?

চোরচিত্তাতপার 'ভুক্তিদার' বা ভুঁইদার পর্যন্ত দেখা করতে এলেন নিজে। কেনারামের যোগসাজসেই ব্যাপারটা ঘটলো। ভুঁইদার বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ হয়ে ফিরে গেলেন এবং দিনকয়েকের মধ্যেই জানতে পারা গেল, তিনি ব্রাহ্মণকে প্রায় আট কুড়ব দৈর্ঘপ্রস্থের একখণ্ড নিষ্কর ভূমি দান করলেন,—দানপত্রের খসড়া রাজকীয় 'পুস্তপাল'-এর কাছে অচিরাৎ পাঠানো হলো। 'পুস্তপাল' তাঁর বিশাল অট্টালিকায় রক্ষিত উক্ত গ্রামের 'পট্টোলি বার করে গ্রামের ভূমি-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি উদ্ধার করলেন। দেখা গেল, আট কুড়ব জমি 'পুঁটিয়া' গাঁয়ের সংলগ্ন হলেও সঠিক পুঁটিয়ার সীমানার মধ্যে পড়ে না। এ-জমি, এবং জমির সংলগ্ন জঙ্গল-মহলে আরও পুরাতন এক গাঁয়ের স্মৃতি বহন করছে, যার নাম,—'বটগোহালী।'

অতএব, উক্ত দানপত্রের খসড়া শুদ্ধ করে রচনা করার জন্য রাজসন্নিধানে পাঠানো হলো। খসড়ায় 'পুঁটিয়া'র নাম কেটে, 'পুঁটিয়া' সংলগ্ন 'বটগোহালী' গ্রামের অন্তর্গত বলে কথাগুলো লেখা হলো।

ফিরে এলো সেটা 'পুস্তপাল'-এর কাছে। জমি সংক্রান্ত

যাবতীয় পট্টোলি বা কাগজপত্র রাখা তাঁর কাজ। সারা অট্টালিকা জুড়ে সারি সারি থাকে-থাকে সব সাজানো আছে। 'পুস্তপাল' মহাশয় তাঁর কর্মচারীদের সাহায্যে স্থির নিশ্চয় হলেন যে, এ-জমি নিয়ে কোনো বিরোধ নেই, বা, কেউ এ-জমি ক্রয় করবার জন্য কোনো আবেদনপত্রও কোনদিন পাঠায়নি।

পরবর্তী বিচার্যবিষয় হলো, জমিটা দান করলে রাজকীয় কোনো কর্ম বা রাজকীয় কোনো স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছে কিনা। 'পুস্তপাল' দেখলেন,—না সে-সব কিছু নয়। অতএব, খসড়াটি অনুমোদিত করা যেতে পারে।

সেই সর্তে খসড়া আবার গেল রাজসভায়। সেখান থেকে গেল সংশ্লিষ্ট 'ভুক্তিদার' বা ভুঁইদারের কাছে। তিনি রাজকীয় নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত ভূমিদান সংক্রান্ত দুটি 'পট্টোলি' প্রস্তুত করলেন। একই পট্টোলি, একটি অপরটির প্রতিলিপি মাত্র। তাতে ভুঁইদার তাঁর স্বাক্ষর দান করলেন, নিজনামাঙ্কিত বিশেষ চিহ্নও যুক্ত করলেন, তারপর আবার পাঠালেন রাজসভায়। রাজসভা স্বীকৃতি দিয়ে সেটা ফেরৎ দিলেন পুনরায় পুস্তপালের কাছে। পুস্তপাল দুটি পট্টোলির একটি সযত্নে রক্ষিত করে অপরটি পাঠিয়ে দিলেন ভুঁইদারের কাছে। ভুঁইদার একদিন শুভলগ্ন দেখে সেটি মোড়ল ও গ্রামবাসীদের সামনে ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করলেন।

তারপরে সদলবলে সবাই গেলেন 'বটগোহালী' গাঁয়ে। কেনারামের বাড়ির কয়েক পা দূরে মাত্র। এটা যে 'বটগোহালী', তাই কেউ জানতো না।

যাহোক, মাপজোঁপ করে দেখা গেল জমিটা উচ্চ জমি, বসতবাটির উপযুক্ত কয়েকটা তালগাছ আর হরিতকী গাছও পড়েছে জমির মধ্যে। আটকুড়ব কম জমি নয়। ছোট-খাটো একটা মেলা বসে যেতে পারে।

সবাই কাজকর্ম সেরে চলে যাবার পর, 'বটগোহালী'র তালীবনের নীচে বসে পট্টোলী হাতে চুপচাপ ভাবছিলেন পট্টোলীর

অধিকারী বিশ্বম্ভর মিশ্র। একা মানুষ তিনি, এত বড়ো জমি নিয়ে কী করবেন? দেশ থেকে আনাবেন কী পুত্র কন্যাদের? পুত্রটি বড়ো, তার উদ্বাহ-কার্য্য নিজেই সমাধা করে এসেছিলেন, বছর দেড়েক সবশুদ্ধ গত হলো, কোন বংশপ্রদীপ গৃহে এলো কিনা এর মধ্যে, কে জানে।

কিন্তু না, মনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ নেই। তারা ভালোই আছে, ভালোই থাকবে। রাজ-অনুগ্রহে সেখানেও নিজের জমি, নিজের বাড়ি। বিষয়-বুদ্ধি তেমন না থাকলেও অসুবিধায় পড়বার ভয় নেই। প্রতিবাসীরাও সজ্জন। ওরা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক করতে পারবে।

'কিন্তু আমি? আমি এখানে কী করবো?'—নিজের মনে বসে নিজেই প্রশ্নোত্তর করতে লাগলেন ব্রাহ্মণ—'আমার অজ্ঞাতবাসকালে আমি কী সঙ্গীত-সাধনায় নিমগ্ন থাকবো, না, কোনো ভিন্নতর কমকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবো?'

আর তারপরে, এই বিষয়? এ-নিয়ে তিনি কী করবেন? এই আটকুড়ব জমিতে তিনি কী প্রাসাদ নির্মাণ করবেন, না পর্ণকুটির!

পর-পর কয়েকটা দিন তিনি আত্মস্থ হয়ে রইলেন। বিশেষ কোনো বাক্যালাপ করলেন না কারুর সঙ্গে, শুধু স্থানে নির্জন স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আপন মনে।

কেনারাম কিন্তু স্তব্ধ হয়ে নেই। সে লোকজন নিয়ে ওঁর ভূমি সন্নিহিত জঙ্গল-মহাল বেশ কিছুদূর পর্যন্ত নির্মূল করে ফেললো। তারপর শুভদিন দেখে ওঁর জন্য গৃহ-নির্মাণে হাত দিলো।

আনমনে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলেন ব্রাহ্মণ সেদিন প্রত্যুষে,—হঠাৎ একটা কোলাহল কানে যেতেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হলো, কোলাহলটা আসছে তাঁরই ভূমির কাছ থেকেই। ত্বরিত পায়ে গেলেন সেদিকে। গাঁয়ের প্রায় সকল সমর্থ পুরুষই জড়ো হয়েছে ওখানে। কারুর হাতে কোদাল, কারুর হাতে ঝুড়ি। তারা নিজেদের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে কলরব করছে, কিন্তু

মাটিতে কোদাল বসাচ্ছে না, যেন কারুর নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

তাঁকে দেখে সবাই নীরব হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কে একজন বললে,—ঠাকুর, আপনি এখানে? মোড়ল যে আপনাকে খুঁজতেই 'জাগুলীর থানে' গেল।

—কেন?

—আজ আমরা মাটি কাটবো এখানে। আপনার জন্যে ঘর বানাবো। আপনার অনুমতি না হলে ত সেটা সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মণ নিরুত্তরে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

ততক্ষণে কেনারাম এসে গেছে হন্তদন্ত হয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—আপনি অনুমতি করুন, ঠাকুর।

এক মুহূর্ত থেমে থেকে ব্রাহ্মণ হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন,—না।

—না!

সবিস্ময়ে সমস্ত জনতা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

উনি বললেন,—আমি একা মানুষ। আমার ঘরদোর দরকার নেই।

কেনারাম বয়স্থ ব্যক্তি, গাঁয়ের লোকেরা যাকে বলে,—'পাকামাথা'। সে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কী যেন ভাবলো এক মুহূর্ত, তারপরে ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে তালীবনের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো, বললে,—ঠাকুর, আপনি ত সন্ন্যাসী নন, একা থাকবেন কী করে?

—তার অর্থ!

কেনারাম বললে,—দোষ নেবেন না প্রভু, আপনি এর মধ্যে 'সংসার' করেছেন কিনা জানি না, করলেও আরেক 'সংসার' করা কি সম্ভব নয়?

'সংসার' অর্থে 'বিবাহ'ই বোঝাতে চাইল কেনারাম।

মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল ব্রাহ্মণের। বললেন,—'সংসার'

করেছিলেন বুঢ়ণ মিশ্র। প্রায় প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত কোন্ ব্রাহ্মণ অবিবাহিত থাকে, সন্ন্যাসী না হলে !

—তাহলে ? কেনারাম বললে,—না হয় আদেশ দিন, আমরাই গিয়ে মা-ঠাকুরাণীকে নিয়ে আসি।

চুপ করে রইলেন ব্রাহ্মণ। মনটা দ্রব হয়ে গিয়ে অক্ষিকোণ সজল করে তুললো এক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই সামলে নিলেন নিজেকে, বললেন,—বুঢ়ণ মিশ্র মারা গেছে। বিশ্বম্ভর মিশ্র অকৃতদার, এ-কথাটাই মনে রেখো তোমরা।

কেনারাম বললে,—তাহলে ত কথাটা অন্যায্য বলিনি প্রভু। আপনি 'সংসার' করুন। চোরচিতাতপায় কিছু ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের মধ্যে আপনাদের পাল্‌টি ঘর অবশ্যই মিলবে।

ব্রাহ্মণ অল্প একটু হাসলেন, বললেন,—ব্যস্ত হয়ো না, প্রয়োজন হলে আমিই তোমাকে বলবো।

কেনারাম বললে,—তবে ঘর তৈরী করতে বাধা দিচ্ছেন কেন ?

ব্রাহ্মণ বললে,—জাগুলীর থানে থাকবার মতো ঘর তো তোমরা দিয়েছো। আলাদা করে ঘরের আর কী দরকার ?

কেনারাম ব্রাহ্মণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওঁর অন্তর-জগতে কিসের প্রবাহ যে চলেছে তা' বুঝবার কথা নয় কেনারামের। সে শুধু ভাবতে লাগলো,—এ রকম নির্লোভ মানুষ সত্যিই সে আর দেখেনি ! 'ভূমি' পেয়েও কি উনি শেষ পর্যন্ত ভোগ করবেন না ?

দিনকয়েকের মধ্যেই তার জিজ্ঞাসার উত্তর পেলো কেনারাম। তাদের গ্রামের সবাই কৃষিজীবী। কৃষিকেই কেন্দ্র করে তাদের সব কিছু। সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি আর সমস্যা। প্রচণ্ড খরার দিনে মাঠ যখন খাঁ-খাঁ করে, সবার মুখ অম্‌নি শুকিয়ে যায়, অন্তরটা আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে, 'জাগুলী' বা 'মা মনসা'র থানে এসে পুজো দেয়, ব্রাহ্মণকে অনুনয়-বিনয় করে,—কৃপা করে কিছু একটা করুন ঠাকুর, আপনার কৃপা হলে সব হবে।

এমনি ওদের বিশ্বাস জন্মে গেছে ওঁর সম্পর্কে।

ব্রাহ্মণ ওদের লক্ষ্য করেছেন বর্ষার দিনে, শীতসমাগমে, বাসন্তী-স্নিগ্ধতা-সঞ্চারে। দেখেছেন, সবাই কর্মী ও পরিশ্রমী। তেমনি স্বভাবে সরল, অনাড়ম্বর, অল্পেই সন্তুষ্ট। কৃষকপত্নী খানকতক শাড়ী, তালিপত্রের কর্ণাভরণ, পদ্মনালিমার বলয় আর শঙ্খচক্রেই আহ্লাদিতা। কখনো কখনো বিবাদ-বিসম্বাদ যে নানাকারণে দেখা দিতো না এমন নয়, কিন্তু তাদের সবকিছুর সুষ্ঠু বিচার করে দিতেন 'কুলপঞ্চ',—তাদের 'প্রধান' ছিল কেনারাম, গ্রাম্যভাষায় 'মোড়ল'। দীর্ঘদিন ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ওদের ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলেন তিনি। এরা পুঁথিগত বিদ্যায় নিরক্ষর হলেও জীবনের পাঠ নিতে জানে। মনটাকে বিস্তৃত ও উদার ভূ-প্রবৃত্তির মধ্যে বিলগ্ন করতে পারে। তার ফলে একটা সহজাত কবিমন ওদের মধ্যে গড়ে ওঠে, নানান ভাবে তা' আত্মপ্রকাশ করে। কোনো কোনো তরুণ মাঠে একা চাষ করতে করতে স্বতস্ফূর্তভাবে গান গেয়ে ওঠে, কেউ কেউ পট আঁকবার চেষ্টা করে, কেউ বা মাটি দিয়ে মূর্তি গড়বার প্রয়াস করে।

সম্ভবতঃ এই সব প্রবণতার কথা ভেবেই তিনি অবশেষে একটি স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন। ডেকে বললেন কেনারামকে,—আজ সন্ধ্যায় 'কুলপঞ্চ'কে আহ্বান করো। আহ্বান করো আরও সব গ্রামীণদের। আমি তোমাদের কাছে আমার একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবো।

পর মুহূর্তে একটি সাড়া পড়ে গেল যেন সারা গ্রামে। সন্ধ্যা হতে না হতেই সবাই এসে উপস্থিত হলো জাঙুলীর থানে। যে ব্রাহ্মণ বিষধর সর্পকে পর্যন্ত মন্ত্র-বলে বশ করেন, তিনি নিজে ডাক দিয়েছেন সবাইকে, না এসে ওরা পারে?

কেনারাম বললে,—আজ্ঞা করুন, ঠাকুর।

ব্রাহ্মণ বললেন,—আমাকে যে ভূমি তোমরা দান করেছো, সেই ভূমিতে তোমরা একটি মন্দির তৈরী করো, এই আমার অনুরোধ।

—মন্দির!

লোকগুলি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে ওঁর দিকে। ওদের মুখপাত্র-রূপে কেনারাম বলে,—আপনি বলছেন কী ঠাকুর। আমরা গরীব মানুষ, আমরা পারবো কী করে? ব্রাহ্মণ বললেন, যা তোমাদের সাধ্যের মধ্যে, তাই করবে। পাথরের গাঁথুনী তুলতে যাব না, অর্থেরও প্রয়োজন হবে না। ঠিক যেমন তোমরা জাগুলীর থান করেছো, অমনি মাটি ভিৎ আর দাওয়া করবে, শাল খুঁটি পুঁতবে চালের জন্য, আর চারদিকে দেবে দরমার বেড়া। কী, পারবে না?

লোকগুলোর চোখ থেকে তখনো বিস্ময়ের ঘোর মিলিয়ে যায়নি, তাদের কেউ কেউ বললে,—পারবো না কেন ঠাকুর, আপনার আদেশ হলে নিশ্চয় পারবো। কিন্তু, আপনি ভূমিটা খোয়াবেন কেন ঠাকুর, ঐরকম মন্দিরই যদি করবেন এই 'মা-জাগুলী'র থানই ত রয়েছে!

ব্রাহ্মণ বললেন,—এ-জায়গাটা ছোট আর তাছাড়া, আমি যে-রকমটি চাইছি, ঠিক তেমনটি হওয়া চাই।

—আপনি কেমনটি চান ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ বললেন,—খড়ি আনো, পিঁড়ি আনো, দেখাচ্ছি।

কে একজন উঠে একটা বড়ো একানে কাঠের পিঁড়ি নিয়ে এলো, খড়িও নিয়ে এলো।

ব্রাহ্মণ সেই পিঁড়ির ওপর তাঁর পরিকল্পনাটা এঁকে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন,—ভূমিটা লম্বায় বেশী, আড়ে কম, কেমন?

—আজ্ঞে।

ব্রাহ্মণ বললেন,—চার সীমানায় চারটে দাগ দিলাম, কেমন?

—আজ্ঞে।

—এখন এই চারটি সীমা—এর চারদিকে দাওয়া উঠিয়ে দরমা ঘিরে ঘর করতে হবে, বুঝলে?—মিশ্র বলে চললেন, পুব দিকে দরজা থাকবে ভিতরে ঢুকবার। তাহলে কী হলো? চারদিকে সব ঘর হলো, পুবের দরজাটা বাদ দিলে? তাই না?

—আজ্ঞে।

মিশ্র বললেন,—চারদিকে সারি সারি ঘর,—ভিতরের দিকে কিছুটা ফাঁকা জায়গা, তারপরেই মূল মন্দির, সামনে নাটশালা। যেমন তোমরা এই 'কুলপঞ্চ'র সভাঘর করেছো, অনেকটা এরই মতো, চালাটা হবে আরও উঁচু আর মাটির ভিৎটা হবে আরও লম্বা। তারপরেই ছোট্ট মন্দির, যেখানে বিগ্রহ থাকবেন। মন্দিরও হবে মাটির ভিতের ওপর দরমা-ঘেরা, চালাটা 'আটচালা' ধরনের কোরো, তাহলেই হবে। দেবতা থাকবেন পুবমুখী হয়ে।

লোকগুলি মিশ্রের পরিকল্পনা সবটা তখন না বুঝলেও সমবেত ভাবে একটা-কিছু করবার মতো কাজ পেলো। দেখতে দেখতে তারা লেগে পড়লো কাজে। মিশ্র নিজে কেনারামকে নিয়ে কাজের তদারক করতে লাগলেন। মাটি কাটালেন ভূমিটার তিনদিক বেষ্টন করে, ভূমিটার সীমানার কয়েক হাত ভিতরের দিক ধরে। পুবে রইলো পথ, আর তিনদিক ঘিরে মাটি কাটার জন্য সৃষ্ট হলো খাদ, সেই খাদে বর্ষার জল জমে তৈরী হলো জলাশয়। মাটির বুনিয়াদের ওপর যখন সারি সারি দরজা-ঘেরা ঘর উঠে গেল, তখন সমগ্র স্থানটা দেখাতে লাগলো ছোটখাটো একটা গড়ের মতো। মাঝখানে নাটশালা আর মন্দির, নাটশালার মাঝে-মাঝে বড়ো-বড়ো শালখুঁটিগুলো শোভা পেতে লাগলো থামের মতো। মূল মন্দিরটির ওপরে স্থাপিত হলো খড়ের আটচালা।

কেনারাম বললে,—আমাদের যা করবার তা করলাম। এবার আপনার কাজ করুন ঠাকুর। কোন্ দেবতার 'থান' হবে এই মন্দির? মা-জাগুলীর?

মিশ্র বললেন, মা-জাগুলী ত রইলেনই গাঁয়ে, আরও একজন দেবতা আসুন।

—কে আসবেন?

মিশ্র বললেন,—কিছুদিন অপেক্ষা করো।

গ্রামের মধ্যে একটি তরুণকে তিনি লক্ষ্য করতেন, সে সবার

মতো ক্ষেতে কাজ করতো বটে, কিন্তু, অবসর পেলেই মাটির তাল নিয়ে এসে আপন মনে পুতুল গড়তো। ইঁদুর, ব্যাঙ, সাপ, বাঘ,—এইসবই ছিল তার বিষয়বস্তু। সেগুলো সে রোদে শুকিয়ে নিয়ে গাঁয়ের শিশুদের মধ্যে বিলিয়ে দিতো।

বয়স বেশি নয় ছেলেটির, উনিশ-কুড়ি। মিশ কালো দেহের বর্ণ, কিন্তু লাবণ্য যেন ঠিক্‌রে পড়ছে গা থেকে, পেশীবহুল সুগঠিত শরীর। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বড়ো-বড়ো চুল কাঁধ পর্যন্ত এসেছে নেমে, চোখদুটি টানা-টানা, চোখের তারা ঈষৎ পিঙ্গল।

সস্নেহে একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—নাম কীরে তোর ?

সলজ্জ উত্তর করেছিলো,—দিব্যো।

এই দিব্যোর বিয়েও দিয়েছিল তার বাপ-মা কিছুদিন আগে। ছোট্ট, বছর দশ-এগারো বছরের বউটি। কাপড় পরে একটু উঁচু করে, হাঁটুর সামান্য নীচে নামে শাড়ীর পাড়, পায়ে মল ঝম্‌ঝম্‌ করতে করতে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যায় সখীদের সঙ্গে। গলায় রূপার শতনর, কানে তালপত্রের আভরণ, হাতে শঙ্খবলয়,—তাতেই চমৎকার মানায় ওকে। দেহের হরিদ্রাভ বর্ণ কাঁচা সোনার মতো ঝলোমলো করতে থাকে।

বউটির নাম তিনি জানেন না, জানার দরকারও নেই, তাঁর প্রয়োজন দিব্যোকে নিয়ে।

কেনারামকে বললেন সেকথা। বললেন,—দিব্যোকে দরকার। ওকে দিয়ে বিগ্রহ তৈরী করাবো।

সবিস্ময়ে কেনারাম বললে,—ও কি পারবে ?

—পারবে।

দিব্যো ওঁর কাছে আসতে লাগলো কেনারামের নির্দেশে। তিনি ওকে নিয়ে মন্দিরেরই সংলগ্ন এক কক্ষে প্রবেশ করলেন। শুরু হলো ওঁদের দুজনের কাজ। মাটি আসে, তৈরী হয় মূর্তি, কিন্তু কিছুতেই আর মনোমত হয় না, ফেলে দিতে হয়। অবশেষে,

প্রায় মাস দুয়েক ক্রমাগত চেষ্টায় দিব্যো তৈরী করে বিগ্রহ। খুব বড়ো নয়। হাতখানেক কি তার একটু বেশী হবে মূর্তির দৈর্ঘ্য। চার হাত,—এক হাতে শঙ্খ, অন্য হাতে চক্র, তৃতীয় হস্তে গদা, চতুর্থ হস্তে পদ্ম।

অনেক আয়াসে অনেক যত্নে সেই মূর্তিকে পুড়িয়ে নিলেন। তারপরে সেই পোড়া মূর্তিকে ইঙ্গুদী তৈলে নিমজ্জিত করে রাখলেন কয়েকটা দিন।

তৈল থেকে তারপরে জলে।

এবং তারপরে এক শুভদিনে দেবতা অধিষ্ঠিত হলেন মন্দিরে।

কেনারামের দল এসে প্রশ্ন করলো,—কী মূর্তি ঠাকুর?

—নারায়ণ।

মন্দিরেরই একটি কক্ষে এসে বাস করতে লাগলেন বুঢ়ণ মিশ্র। নারায়ণের পূজারীও হলেন আর গ্রামান্তর থেকে তৈরী করে আনা একটি তম্বুরা নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা নাটশালায় বসে আলাপ করতে লাগলেন সিদ্ধ সুর।

দিব্যো ঠাকুরের খুব অনুগত হয়ে পড়েছিল। সময় পেলেই সে এসে ঠাকুরের কাছে বসতো, তন্ময় হয়ে শুনতো সেই সুর।

মিশ্র কিন্তু মাত্র দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির করেননি। ক্রমশঃ সবাইকে তিনি ডেকে আনতে লাগলেন মন্দির প্রাঙ্গণে। মন্দির সংলগ্ন যে কক্ষগুলি ছিল, তার একটিতে বসলো পাঠশালা, অন্য একটিতে দিব্যো বসে তৈরী করতে লাগলো নানারকম পুতুল। দিব্যোর দশ-এগরো বছরের ছোট্ট বৌটি মধ্যাহ্নে নারায়ণ বিগ্রহকে প্রণাম করার অছিলায় সুযোগ বুঝে উঁকি দিতে আরম্ভ করলো সেই ঘরে।

—এই, কেউ দেখে ফেলবে।

বউটির নাম সব্বানী, সে দুষ্টুমীভরা দুটি চোখ তুলে ওর দিকে

তাকালো, ঠোঁটের কোণে টেনে আনলো বাঁকা হাসি, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর দিকে নীরবেই তর্জনী তুলে ধরলো, বাঁকাস্বরে বললো, কেমন মজা! থাকো আট্‌কা সারা দুপুর ধরে।

দিব্যো বললে—আট্‌কে থাকবো কী? কাজ করছি না?

বউটি বললো,—ছাই কাজ। ও তো পুতুল গড়া, ও আবার কাজ নাকি?

দিব্যো উত্তর করছে—নতুন নতুন পুতুল। দেখছো না?

চারদিকে তাকিয়ে দেখলো সব্বানী, কেউ কোথাও নেই, ঠাকুর পাঠশালার ঘরে শিষ্যদের পড়াচ্ছেন, চট্‌ করে তাই ভিতরে চলে এলো, স্বামীর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার কাঁধে হাতখানা ছুঁইয়ে রেখে বলে উঠলো,—একটা পুতুল আমাকে দেবে?—

ঈস্!—দিব্যো বলতো, তোকে দেবো কেন? এসব মন্দিরে সাজানো হবে, ঠাকুর বলেছেন। চোখ বড়ো-বড়ো করে নির্মীয়মান পুতুলগুলির দিকে তাকিয়ে ছিল সব্বানী, বললে, এ-সব কী গড়ছো?

দিব্যো বললে,—পঞ্চপাণ্ডব। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, এই সব—রাজত্ব ছেড়ে বনে চলেছে। মহাভারতের কাহিনী কথক-ঠাকুরদের মধ্যে দিয়ে তখন গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়তো। তখনকার দিনে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা কথকতা করে বেড়াতেন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে। সব সময় তাদের দেখা মিলতো না এ-সব গাঁয়ে। 'কুলপঞ্চ' সাধ্যসাধনা করে তাঁদের আনাতেন। হয়ত পাঁচ-সাত বছর পরে-পরে এক-একজন আসতেন। কিন্তু তাঁদের 'পুঁটিয়া' বা 'পুঁটে' গ্রামে এ-সব দিক দিয়ে ভাগ্যবান। তাঁদের 'ঠাকুর' তাদের গাঁয়েই বাস করছেন, মাঝে মাঝে পুঁথি খুলে বসেন, কখনো বা একমাস-দু'মাস ধরে একাদিক্রমে। এ-ঠাকুর কথকতায় সবার সেরা। গতবার এমন হয়েছিল যে, 'ভারতের কাহিনী' শুনতে সেই দূর 'চোরচিত্তপা' থেকেও লোক এসেছিল।

এম্‌নি করে গাঁয়ের মেয়েরাও 'ভারতের কাহিনী' মোটামুটি জেনে ফেলেছিল। কাশীরাম দাস তখনো আবির্ভূত হননি।

কলিঙ্গদেশের 'ভারত-কবি'ও জন্মগ্রহণ করেননি। তখন 'ভারত-কথা' বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের মতো করে রচনা করে নিতেন এইসব অখ্যাত অজ্ঞাত 'কথকতাকার'গণ।

আশেপাশের গাঁয়ে, কিম্বা 'চোরচিতাতপা'র মতো জনপদে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল মিশ্র-ঠাকুরের অপূর্ব কথকতার ছন্দ ও সুর। তারা ওঁকে বহু সাধ্যসাধনা করেছে নিজেদের গাঁয়ে বা জনপদে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু উনি কখনো যাননি। বলেছেন,—'কথকতা' আমার পেশা নয়।

যাইহোক, সব্বানী পঞ্চপাণ্ডব কারা, সেটুকু জানতো। তাই স্বামীর কথার উত্তরে চাপা অথচ সাগ্রহ কণ্ঠে বলে উঠলো,—দোপদী কই?

দিব্যো হেসে বললো,—দোপদী নয় রে, দ্রৌপদী। তাকে এখনো গড়িনি।

—গড়তে জানলে তো!—বলে, স্বামীকে ছেড়ে দৌড়ে ঘর থেকে পালালো সব্বানী। বাইরে কাদের পদশব্দ বেজে উঠেছে বুঝি!

বুঢ়ণ মিশ্র ধীরে ধীরে মন্দিরের একটি নতুন রূপ দিলেন। অথবা, ভাষান্তরে বলা যায়, তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করলেন। দেখা গেল, মন্দির-সংলগ্ন সব ঘরগুলিই কাজে লেগে গেছে। 'কুলপঞ্চ' রইলেন মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক, তাঁদেরই অধীনে একটি কক্ষ গ্রামের 'করণ-গৃহ'-এ পরিণত হলো। সেখানে তাঁরা এসে নিয়মিত বসতে শুরু করলেন, এমনকি পাঠশালার একটি ছাত্র হিসাব পর্যন্ত রাখতে লাগলো। আয়-ব্যয়ের হিসাব। গ্রামে উৎপন্ন সমস্ত ফসলের কিছু অংশ একটি কক্ষে জমানো হতো, যারা জমা দিতো, তাদের নাম ও জমার পরিমাণ লিখে রাখা হ'ত। সেই ফসল-বিক্রীর টাকা থেকে সামান্য অংশ 'সঞ্চিত অর্থ' হিসাবে রেখে দিয়ে বাকীটা জমাকারীকে দিয়ে দেওয়া হতো। অন্য একটি কক্ষে সুদৃঢ় সিন্ধুকে 'সঞ্চিত অর্থ' রাখা হতো, ভিন্ন সিন্ধুকে রাখা হতো গ্রামের

ভূমি-সংক্রান্ত যতো 'পট্রোলী'। এসব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রামেরই বলবান কয়েকটি যুবককে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

মন্দিরে পাঠশালা যেমন ছিল, শরীর-চর্চারও বিভাগ ছিল। শরীর-চর্চা ও অস্ত্র-শিক্ষা। অন্যদিকে শিক্ষাচর্চা। দিব্যো যেমন পুতুল-তৈরী শিখ্‌ছে, তেমনি অন্য একটি তরুণ শিখ্‌ছে পট-অঙ্কন। 'চোরচিতাতপা'র ভূঁইদার নিজে এসে এ-সব দেখে এমন উদ্বুদ্ধ হলেন যে, তিনি নিজের গ্রামে অবিলম্বে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তিনি অর্থশালী, ভিন্‌ দেশ থেকে পটুয়া আনিয়ে তাঁর গ্রামে 'বসত' করালেন। মাঝে মাঝে সেই পটুয়াদেরই একজন আসতো 'বটগোহালী'তে ছাত্রদের শেখাবার জন্য।

এইভাবে দিন যায়। একদা সন্ধ্যার পর নাটশালায় বসে দুটি শিষ্যকে তিনি সঙ্গীতের পাঠ দিচ্ছেন, একটি লোক ছুট্‌তে ছুট্‌তে তাঁর গায়ে এসে পড়লো। লোকটি আর কেউ নয়, স্বয়ং কেনারাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—ঠাকুর, সর্বনাশ!

—কী?

—কাতারে-কাতারে সৈন্য ছুটে আসছে সড়ক দিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই শোনা গেল দূরাগত অশ্বক্ষুরধ্বনি। ব্রাহ্মণ বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—কারা ওরা? কোথাকার সৈন্য?

বুঝতে পারছি না তো!

—যুদ্ধবিগ্রহ এককালে লেগেই থাকতো। কিন্তু সুশাসক গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন কলিঙ্গ বিজয় করবার পর বঙ্গ ও কলিঙ্গে শান্তি নেমে এসেছিল। তাই সৈন্য চলাচল হলেও সাধারণ রাজপথ দিয়েই তারা চলতো। সুন্দর ঝাড়খণ্ডে তারা সচরাচর আসতো না, বা আসবার প্রয়োজন হতো না। সেজন্য, অকস্মাৎ এই সৈন্যসমাগম যথেষ্ট বিস্ময় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে বই কী!

ব্রাহ্মণ বললেন,—এসো আমার সঙ্গে।

কয়েক পা চলার পরই ওঁরা দেখতে পেলেন। অনতিদূরের সড়কে পিলপিল করছে ঘোড়-সওয়ার। তারা থম্‌কে দাঁড়িয়েছে, গ্রামের দিকে আঙুল নির্দেশ করে একে অপরকে কী-যেন দেখাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে প্রজ্বলিত মশাল। সেই মশালের আলোয় তাদের লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ ঝলোমল করছিল।

ব্রাহ্মণ রীতিমত শঙ্কিত হলেন এবার। তিনি বুঝলেন, ওরা গৌড়বঙ্গের সৈন্য নয়, এমনকি ওড়িষ্যারাজ কপিলেশ্বরেরও বাহিনী নয়। ওদের বেশবাস ভিন্নধরনের, অস্ত্রশস্ত্রও বিচিত্র আকারের। চেহারাতেও মনে হয়, ওরা বিদেশী।

ব্রাহ্মণ আর কালবিলম্ব করলেন না। কেনারামকে বললেন,—তুমি বৃদ্ধ, শিশু, বালক আর নারীদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী অরণ্যে পালিয়ে যাও। তরুণদের রেখে যাও আমার কাছে। আমি অবস্থা ভালো বুঝ্‌ছি না।

সঙ্গে সঙ্গে ওঁর আদেশ পালিত হলো। ব্রাহ্মণ বললেন,—কেউ কোনো শব্দ করো না। তোমাদের সড়কি, লাঠি আর যে-কটি তরবারি আছে, নিয়ে এসে প্রস্তুত হও।

তা-ই হলো। একদল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে অরণ্যে প্রবেশ করলো, অন্যদল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রাম-প্রবেশের মুখে গাছের আড়াল খুঁজে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কেউ বা বৃক্ষচূড়ায় উঠলো, যাতে করে শত্রুর মাথার ওপর লাফ দিয়ে পড়তে পারে।

ব্রাহ্মণ নিজে হাতে নিলেন একখানা নগ্ন কৃপাণ, তাঁর সঙ্গে দিব্যো এবং আরও কয়েকজন।

সৈন্যদলের সংখ্যার বুঝি শেষ নেই। কাতারে কাতারে তারা এসে উপস্থিত হয়েছে। সড়কের ধারে একদল পরামর্শ করছে। ব্রাহ্মণ দিব্যোকে নিয়ে বৃক্ষান্তরাল দিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলেন। আরও কাছ থেকে লক্ষ্য করলেন ওদের গতিবিধি। তারপর আবার চুপি চুপি পিছিয়ে এলেন নিজেদের জায়গায়।

ফিস ফিস করে বললেন,—দিব্যো?

—আজ্ঞে ?

—ওদের চিনেছি। ওরা তুরুক সওয়ার।

দিব্যো চুপ করে রইলো।

উনি বললেন,—ওদের মতিগতি ভালো নয়। গ্রাম আক্রমণ করতে পারে।

—কেন ঠাকুর ?

উনি বললেন,—ওদের খাদ্যবস্তু প্রয়োজন।

দিব্যো বললে,—তার জন্য মারামারি কেন ? এসে চাইলেই ত পারে।

—না দিব্যো,—ব্রাহ্মণ বললেন,—প্রথমত, অতো লোককে খাদ্য যোগাবার মতো মজুত রসদ তোমাদের নেই। দ্বিতীয়তঃ ওরা আরও এমন কিছু চাইতে পারে, যা তোমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

দিব্যো অবাক হয়ে প্রৌঢ়ের মুখের দিকে তাকালো, বললো,—কী আবার চাইতে পারে ঠাকুর ? ব্রাহ্মণ ওর দিকে তাকালেন। সরল গ্রাম্য তরুণ, যুদ্ধ-বিগ্রহের বিভীষিকার সঙ্গে তখনো পরিচিত হয়নি।

ব্রাহ্মণ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবলেন,—না, ওকে জানানোই দরকার। বললেন,—কেনারাম শিশু আর মেয়েদের নিয়ে জঙ্গলে গেছে। কেন ওদের পাঠিয়েছি বুঝতে পারো ?

দিব্যো তখনো ব্রাহ্মণের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার ধারণা, যদি লড়াই হয়, তাহলে তার সঙ্গে মেয়েদের না থাকাই ভালো। তারা ভয়ে চীৎকার করে উঠতে পারে, স্বামীপুত্রদের লড়াই করতে দেখলে কেঁদে-কেটে অনর্থ করতে পারে।

ব্রাহ্মণ বললেন,—বহু দেশ আমাকে পর্যটন করতে হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহও দেখেছি বহু। এইসব তুরুক সওয়ারদের ব্যাপারও জানি। ওরা সুবিধা পেলে নারী হরণ করে নিয়ে যায়।

—কী বললেন।

—চুপ। চেঁচিও না,—ব্রাহ্মণ বললেন,—তোমার স্ত্রীর নাম যেন কী?

—সব্বানী।

ব্রাহ্মণ বললেন,—ধরো যদি তুরক সওয়ারেরা তাকে ধরে নিয়ে যায়?

সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্তে গরম হয়ে উঠলো দিব্যোর দেহে। সে প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে হয়ত-বা এগিয়ে ছুটে যেতে চাইছিল ওদের মধ্যে, কিন্তু তাকে বাধা দিলেন ব্রাহ্মণ। ওর একটা হাত টেনে ধরলেন, আর নিজের অন্য হাতটা দিয়ে চেপে ধরলেন ওর মুখ। বললেন,—প্রাণপণ করে বাধা দিতে হবে। তোমরা পঞ্চাশজন, আর ওরা হয়ত হাজারের অধিক। 'হাজার' কেন, অগুন্‌তি। তবু ওদের এগিয়ে আসতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এর জন্য বুদ্ধিভ্রংশ হলে চলবে না, মাথা স্থির রাখতে হবে।

ব্রাহ্মণের অনুমান মিথ্যে নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, ক্ষুধিত পঙ্গপালের মতো তারা গ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। যে-পথ দিয়ে তারা বাধা দেবে বলে ভেবেছিল, সেই পথে এলো না! এমনকি, পথেই এলো না তারা। মাঠের পথে—চষা খেত অথবা আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুর্দ্ধর্ষ ঘোড়া ছুটিয়ে তারা এসে পড়লো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত 'পুঁটিয়া' আর 'বটগোহালী' এক শোচনীয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। ওরা সমস্ত কুটিরে মশাল দিয়ে আগুন লাগালো, মন্দির ধূলিসাৎ করলো। আর বুঢ়ণ মিশ্র যতদূর ভেবেছিলেন তার থেকেও বীভৎসতার সৃষ্টি করলো ওরা। খাদ্যশস্য নয়, ওরা অর্থ আর নারীর সন্ধানেই প্রমত্তের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলো।

ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে তাঁর পঞ্চাশজন অনুচরকে একত্র করতে পেরেছিলেন। তাদের নিয়ে গ্রামের পিছন দিয়ে বনান্তরালের দিকে ছুটে গিয়ে একজায়গায় জড়ো হলেন। আর তারপরে কয়েকজনকে পাঠালেন বনের মধ্যে কেনারামের কাছে। বললেন,—

কেনারাম যেরকম করে হোক যেন বনের নীচের দিকে নেমে নদী পার হয়ে চলে যায়। যদিও নদীতে বিশেষ জল নেই তখন, তবু তুরুক সওয়াররা চট্ করে নদী পার হতে চাইবে না। কেনারাম যদি পারে ত যেন চোরচিতাতপার দিকে এগিয়ে যায়।

ব্রাহ্মণের ইচ্ছা ছিল, ওরা পার হবে আর তাঁরা সতর্ক পাহারা রাখবেন। ওরা নিরাপদ হলে তারপর তিনি সবাইকে নিয়ে ওপারে চলে যাবেন। কারণ, এই দুর্দ্ধর্ষ শস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে মাত্র এই স্বল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। তার থেকে বাঁচুক ওদের প্রাণ। সওয়াররা চলে গেলে আবার এসে নতুন করে গ্রাম নির্মাণ করা যাবে।

কিন্তু, মধ্যপথেই ব্রাহ্মণের পরিকল্পনা পর্যুদস্ত হয়ে গেল। সওয়াররা হঠাৎ-ই এক সময় দেখতে পেলো ওদের। দেখতে পেয়ে তীরবেগে ছুটে এলো। তখন আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার লক্ষ্য নেই। দিব্যোই উন্মাদের মতো প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়লো একটি সওয়ারের ওপর। দেখতে দেখতে ক্রুদ্ধ নেকৃড়ে বাঘের মতো গ্রাম্য তরুণ দল রুখে দাঁড়ালো। দিব্যো অসমসাহসিক কাজ করে বস্‌লো। একটি সওয়ারকে সড়কী দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে, তার হাতের ঢাল-তরোয়াল কেড়ে নিয়ে ছুটে গেল আরেকজনের দিকে।

ব্রাহ্মণও কি আর স্থির থাকতে পারেন? দিব্যোকে অভিমন্যুর মতো সপ্তরথী-দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে দেখে ব্রাহ্মণ গিয়ে পড়লেন ব্যূহের মধ্যে। কিন্তু কতক্ষণ? তবু দুটিকে ভূমিলগ্ন করলেন তাঁরা দুজন। আর তারপরে—

তারপর আর কিছু নেই! একটি প্রাণীও বেঁচে রইলো না। শুধু প্রৌঢ় কেনারাম নারীদের নিয়ে বনপথ ধরে এগিয়ে গেল নদীতীরের দিকে।

এ-কাহিনীর সাক্ষ্য ইতিহাসে সম্যক নেই, আছে গ্রাম্য-গাথায়।

কেনারাম পরে এসে গ্রাম অধিকার করতে পারেনি, কারণ, গ্রামটি একটি সৈন্য-শিবিরে পরিণত হয়েছিল পরে। এসেছিল আরও তুরুক-সওয়ার, ঝাড়খণ্ডের এই একটি গ্রাম নয়, বহু গ্রামকে সমভূমি করে—জ্বালিয়ে দিয়ে—শ্মশান করে তার ওপরে শিবির স্থাপনা করে উড়িয়ে দিল তাদের বিজয়-পতাকা।

বৃদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণসেন তখন তাঁর তীর্থনগরী নবদ্বীপে এসে বসবাস করছিলেন পুত্রদ্বয়ের ওপরে গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর ভার দিয়ে। আরও তুরুক-সওয়ার এসে পড়লো ঝাড়খণ্ডে। তারা সুবর্ণরেখা পেরিয়ে 'চোরচিতাতপা' ধ্বংস করতেও ছাড়লো না। প্রতিরোধের সম্মুখীন তারা হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সে-সব সুসংবদ্ধ প্রতিরোধ নয়। কোথায় গেল চোরচিতাতপার ভুঁইদার, কোথায় গেল কেনারাম, কোথায় গেল 'বটগোহালী'র নারীদল,—তুরুক সওয়ার নিঃশেষ করলো সবাইকে, আর নারীকূলের মধ্যে যাদের পছন্দ হলো, তাদের নিয়ে এলো শিবিরে। ঝাড়খণ্ডের এই অঞ্চল জুড়ে তখন স্থাপিত হয়েছে ওদের প্রথম শিবির। সে শিবিরে সর্বানীর মতো হতভাগিনীদের আর্তচীৎকার শোনা যায় নিশীথ রাত্রে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন তখন নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে তীর্থপুণ্যলাভ-বাসনায় বসবাস করছেন। তুরুক সওয়ার এসে নদীয়ার দ্বারদেশ অবরোধ করে বসে রইলো। বণিক ও আত্মীয়বর্গ মহারাজকে পরিত্যাগ করে চলে গেল। অবরোধের রুদ্ধশ্বাসে অরাজকতা শুরু হলো তীর্থনগরীতে। সংহতি নেই, শুধু স্বার্থবোধ আর পলায়নী মনোভাব। এর মধ্যে কাঞ্চন-মূল্যে কিছু বিশ্বাসঘাতক সৃষ্ট করা আদৌ কঠিন কাজ নয় 'তুরুক সওয়ার'দের পক্ষে। সেই বিশ্বাস-ঘাতকদের রন্ধ্রপথ দিয়ে এক সঙ্গে প্রবেশ করলো অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে তুরুক সওয়ার। তারা প্রথমে, তাদের পিছনে অগণিত বাহিনী।

এর পরের ইতিহাস অপরিজ্ঞাত নয়। অতর্কিত আক্রমণে

বিধ্বস্ত হলো বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের শক্তি। তিনি পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। এর পরে উত্তরবঙ্গ ও তারও পরে পূর্ববঙ্গে সব মিলিয়ে প্রায় বছর পাঁচেক রাজত্ব করেছিলেন তিনি। কিন্তু সে-কথা স্বতন্ত্র।

যে-বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তুরুক সওয়ারদের শিবির গড়ে উঠেছিল 'সুবর্ণরেখা'র এপার-ওপারে, সেখান থেকে একদিন তারা চলে গেল। চলে গেল নদীয়ার দিকে, গৌড়-বঙ্গ 'লক্ষ্মণাবতী'র দিকে। 'লক্ষ্মণাবতী' ক্রমশঃ 'লক্ষ্মৌতি'তে পরিণত হয়ে নব নব ইতিহাস রচনা করতে লাগলো,—আর এদিকে ঝাড়খণ্ডের এই অঞ্চল বিরাট এক অরণ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়ে রইলো। কোথায় হারিয়ে গেল 'বামুন-পৈঠে'র সেই প্রাচীন বটগাছ, কোথায় মিলিয়ে গেল 'পুঁটিয়া—বটগোহালী' গ্রাম, তার কেউ উদ্দেশ রাখলো না।

এই যে বিস্মৃতি, এর পটোত্তলন হয়েছিল উক্ত ঘটনার তিন শ' বছর পরে,—ষোড়শ শতাব্দীতে। তখন সুবর্ণরেখার উত্তর তীর ধরে ধরে কিছুদূর পর্যন্ত ছোট-ছোট জনপদ গড়ে উঠেছে মল্লভূম রাজাদের কল্যাণে। ও-অঞ্চলের নামই তখন হয়েছে মল্লভূম পরগনা। 'চোরচিতাতপা'র ভুঁইদারের বিধ্বস্ত গড়ের ওপর দিয়ে তিনটি শতাব্দী পার হয়ে গেছে। কীভাবে কোনো এক অজ্ঞাতনামা দুঃসাহসিক কয়েকটি 'পট্রোলী' প্রাপ্ত হলেন একদিন।

যেদিন এই পট্রোলীগুলি পাওয়া যায় সেদিনটি ইতিহাসের এক বিশেষ চিহ্নিত দিন। গৌড়-বঙ্গ তখন হোসেন সাহের অধিকারে। উড়িষ্যাতেও তখন এক পরাক্রমশালী রাজা বিদ্যমান,—তাঁর নাম প্রতাপরুদ্র। হোসেন সাহ এই প্রতাপরুদ্রকে পরাভূত করতে পারেননি। তখন বঙ্গ ও ওড়িষ্যার সীমানার কাছে উভয় পক্ষই তীক্ষ্ণ শূল পুঁতে রাখতো। আর সেই সব শূলে গুপ্তচর-সন্দেহে কতো যে নিরপরাধ পথিক প্রাণত্যাগ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বঙ্গের দক্ষিণ-অঞ্চলে হোসেন সাহের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি তখন

ছিলেন রামচন্দ্র খান। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের বিশেষ একটি দিন সেটি। এই রামচন্দ্র খানেরই সাহায্যে বঙ্গ-ওড়িষ্যার সীমান্ত নির্বিঘ্নে পার হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব চলে গেলেন নীলাচলে।

তিনি যেদিন ছত্রভোগের পথে বঙ্গ-ওড়িষ্যার সীমান্ত পার হন, ঘটনাচক্রে সেই দিনই সুবর্ণরেখার উত্তর তীরের একটি ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেল কয়েকটি পট্টোলী। নীলাচলে চলতে লাগলো শ্রীচৈতন্যের সাধন-লীলা, আর ওদিকে তখন গড়ে উঠতে লাগলো সেই পুরাতন 'চোরচিতাতপা'। পট্টোলী-আবিষ্কারক সাহসী পুরুষটি পুরাতনের নিকটেই গড়ে তুললেন নূতন জনপদ,—এবং তারপর ক্রমশই তিনি নদী পার হয়ে দক্ষিণদিকের অরণ্যে আসতে লাগলেন। তিনি যে-সব পট্টোলী পেয়েছিলেন, তার মধ্যে একটিতে ছিল,—বিশ্বম্ভর মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করা হলো বটগোহালী গ্রামের কিছু অংশ।

কিন্তু কোথায় এই বটগোহালী গ্রাম? মৃত বুঢ়ন মিশ্র আর মৃত দিব্যোর আত্মা যেন তিন শতাব্দী ধরে নির্জন অরণ্য ভূমিতে হাহাকার করে ফিরেছে। বিদেহী ব্রাহ্মণের দীর্ঘশ্বাস যেন অরণ্যকে শিহরিত করেছে বার বার। বার বার যেন সেই অব্যক্ত ক্রন্দন আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে, কোথায় আমার সেই দেবতা! কোথায় আমার নারায়ণমূর্তি! আর দিব্যোর আত্মা যেন বলতে চেয়েছে,—এইখানে, এইখানে কোনো এক নিশীথ রাত্রে আমার সব্বানীর ওরা সর্বনাশ করেছিল। দুঃখে-বেদনায় আত্মগ্লানিতে ভরপুর হয়ে এইখানে সে ছুটে গিয়েছিল নামপাড়ার মধ্য দিয়ে সুবর্ণরেখার তীরে। কিন্তু বাঁচতে সে চায়নি, ঐ সুবর্ণরেখার খরস্রোতই সেদিন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দূরে—বহুদূরে!

নীলাচলে প্রতাপরুদ্র যেদিন শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্মে দীক্ষিত হলেন, সেদিন সুবর্ণরেখার উত্তর-তীরের সেই দুঃসাহসী তরুণ নদী-পরপারের এক অরণ্য থেকে বহু পট্টোলী উদ্ধার করলেন অকস্মাৎ। তার মধ্যে একটি পট্টোলই তাঁর সেই পুরাতন পট্টোলীটির হুবহু প্রতিনিধি।

'বিশ্বম্ভর মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করা হলো বটগোহালী নামের কিছু অংশ।'

সানুচর শিবির স্থাপন করলেন সেই দুঃসাহসী তরুণ। অরণ্য-সংস্কার করলেন। একটি ভগ্নপদ-- নারায়ণ মূর্তিও আবিষ্কৃত হলো।

আর তারপর? সেই অজ্ঞাত তরুণ সামন্তরাজেরই সাধনায় একটি মন্দির তৈরী হলো 'বটগোহালী' গ্রামে। কিন্তু তিনি বুঢ়নমিশ্রের সেই পুরাতন মন্দির স্থানটি আবিষ্কার করতে পারলেন না। তাঁর নবনির্মিত মন্দিরটি স্থাপিত হলো একটু দূরে। এবং দেবতা পুবমুখী না হয়ে স্থাপিত হলেন পশ্চিমমুখী। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারও হলো পশ্চিম দিকে। তিন শতাব্দীর আগেকার মন্দিরের ঠিক বিপরীত দিকে, তা-ও কিছুটা ব্যবধান রেখে।

এটা হলো কিছুটা অনবধানবশতঃ। যখন তিনি মূর্তিটি আবিষ্কার করেন, তখন বেশ কিছুটা স্থান তাঁকে খনন করতে হয়েছিল। মূর্তি পাবার আনন্দে তিনি এত বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন যে, ঠিক কোন্ জায়গাটি থেকে সেটা তিনি পেয়েছিলেন, তা খেয়ালে রাখতে পারেননি।

তা' না পারুন, যেটুকু তিনি করলেন, তা-ও বিস্ময়কর। তবে তাঁর মন্দির তৈরী হলো পাথর দিয়ে। সেখানে মূল দেবতা তাঁর মূর্তি পরিগ্রহ করলেন কলিঙ্গস্থাপত্য রীতি-অনুযায়ী, নিকষ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত। সেই পোড়ামাটির ভগ্নপদ মূর্তিটি মন্দির গাত্রে সংলগ্ন করা হলো অন্যান্য বিভিন্ন অলঙ্করণের মধ্যে। এ-মন্দিরেরও ছিল নাটশালা, ছিল বিভিন্ন কথা চতুর্দিক বেষ্টন করা। দেখতে-দেখতে এই অঞ্চলও জনপদে পরিণত হতে লাগলো। নদীর আরও নীচের দিকে—ওপারে 'চোরচিতাতপা'কে রেখে আরও কিছুটা পুবমুখী হয়ে নদীর দক্ষিণ তীরেই নতুন অট্টালিকা-সমাকীর্ণ নয়াবসান নামে এক ক্ষুদ্র জনপদও গড়ে উঠলো।

আর ওদিকে, সেই অজ্ঞাত তরুণ সামন্তরাজ প্রতিষ্ঠিত

'বটগোহালী' গ্রামের মন্দিরটির দেবতার নামকরণ হয়ে গেল কালক্রমে 'বিশ্বম্ভর'।

দিন যায়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কতো রাজার পতন আর উত্থান হতে লাগলো ঠিক নেই। যেদিন নীলাচল থেকে সর্বপ্রথম প্রচারিত হলো,—শ্রীচৈতন্যদেব নীলসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছেন, সেদিন ঐ বিশ্বম্ভর-মন্দির-গাত্র থেকে ঐ একটি মাত্র পোড়ামাটির নিদর্শন,—ভগ্নপদ নারায়ণ-মূর্তিটি হঠাৎ খসে পড়লো।

ঠিক সেই সময়, এক মস্তিষ্ক-বিকৃত মানুষ শুয়েছিল মন্দির চত্বরে। সে কী খেয়ালে হঠাৎ ওটি কুড়িয়ে নিয়ে বনে-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে চলে এলো একেবারে নয়াবসানে। কিন্তু এখানেও সে থামলো না, মূর্তিটাকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের দিকে পালাতে লাগলো সুবর্ণরেখার দক্ষিণতীর ধরে ধরে।

সেদিন সবর্ণরেখায় ঢল নেমেছে, তীব্রস্রোতে সে বয়ে চলেছে নিম্নভূমির দিকে, খেয়া পারাপার বন্ধ, আর আকাশে বজ্রপাত হচ্ছে মুহুর্মুহু। আকাশটা ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ঢাকা। বৃষ্টির ধারা যেন বর্শার ফলকের মতো গায়ে এসে পড়ছে, খণ্ড বাতাস হুঙ্কার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রণক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনীর মতো। পাগল তবু ছুটেছে অরণ্যের মধ্য দিয়ে। কড়্‌কড়্‌ শব্দে যেন বাজ পড়লো, বৃষ্টিধারায় সর্বশরীর সিক্ত, গাছের শাখা আন্দোলিত হয়ে তার অগ্রগমণকে বাধা দিচ্ছে, তবু তার থামবার নাম নেই।

কিন্তু থাম্‌তে হলো তাকে একসময়। এবং সে-থামা চিরকালের জন্য। একটি মহীরুহের শাখা হঠাৎ-ই ভেঙে গিয়ে পড়লো ওর মাথার ওপরে। বৃষ্টিধারার সঙ্গে রক্তধারা মিশে বনভূমি সিক্ত করে দিলো। লোকটার শরীর আগাগোড়া নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ভগ্নপদ নারায়ণ-মূর্তিটির কিছু হয়নি। হয়ত বুঢ়ণ মিশ্রের আশা তাঁর প্রিয় মূর্তিটিকে রক্ষা করলেন। গাছের ডালপালার অড়ালে সে-মূর্তিটি লুকিয়ে রইল বহুকাল।

ঐ ষোড়শ শতাব্দীরই শেষভাগে যিনি সেই মূর্তিটি বনমধ্যে

অকস্মাৎ কুড়িয়ে পান, তাঁর নাম রসিকানন্দ। ইনি বৈষ্ণব, তীর্থান্তরে চলেছিলেন সদলবলে। হঠাৎ পায়ে-চলা পথের পাশে তাঁর চোখে পড়লো ছোট একটি হাত, মাটি থেকে ওপরে উঠে আছে, বাকীটা ধুলোমাটির আস্তরণে ঢাকা। এগিয়ে গিয়ে বহুক্ষণ ধরে সেই ছোট্ট পোড়ামাটির হাতটি দেখতে লাগলেন তিনি। আশেপাশে আর কিছু নেই, শেয়াল অথবা বন্যজন্তুতে সেই পাগলের মৃতদেহ কোথায় যেন নিয়ে গিয়ে শেষ করে দিয়েছিল কে জানে।

সেই পাগলের প্রসঙ্গ রসিকানন্দের পক্ষে জানবার কথা নয়, তিনি দেখতে লাগলেন সেই হাতটি শুধু নিবিষ্টমনে। তাতে ক্ষুদ্র একটি শঙ্খ সংলগ্ন রয়েছে, ঐ পোড়ামাটিরই অবশ্য। বুঝতে পারলেন রসিকানন্দ, এ-নিশ্চয়ই কোনো দেবমূর্তি।

তাড়াতাড়ি তিনি বসে পড়ে মাটি খুঁড়ে বার করলেন ভগ্নপদ নারায়ণ মূর্তি। শিষ্যদের ডেকে বললেন,—আমি আর কোথাও যাবো না, এখানেই বসবাস করবো, এখানেই স্থাপিত করবো এই মূর্তিটিকে।

শিষ্যদের মধ্যে থেকে একজন বললেন,—ভগ্ন মূর্তি কি স্থাপনা করা চলে প্রভু?

রসিকানন্দ বললেন,—না চললেও আমি চালাবো। তিনি যেভাবে দেখা দিয়েছেন, সেইভাবেই ওঁর পূজা করবো।

আর কোন কথা নেই। সেই অরণ্য পথের পাশে কুটির নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন রসিকানন্দ। তাঁর মানস-মূর্তি ছিলেন বংশীধারী গোপীবল্লভ, ছোট্ট অষ্টধাতুর মূর্তিও ছিল সঙ্গে। সেই মূর্তিটির পাশাপাশি ঐ ভগ্নপদ নারায়ণকেও তিনি স্থাপিত করলেন।

এই রসিকানন্দ ছিলেন সুবিখ্যাত কীর্তন-গায়ক। বনমধ্যে তাঁর: ঐ কুটিরে বসে তিনি সুমধুর কীর্তন করতেন, আর সেই সঙ্গীত-সুধা শোনবার জন্য দূর দূর থেকে লোক আসতো। নূতন ধরনের ছিল সেই সুর, তৎকালীন প্রচলিত কীর্তন সুর থেকে ভিন্ন। উনি এর

নাম দিয়েছিলেন,—মন্দারণী। প্রকৃতপ্রস্তাবে কীর্তনের মন্দারণী-সুর ও গায়কীর উনিই ছিলেন স্রষ্টা।

ক্রমশঃ রসিকানন্দ এত যশোলাভ করলেন যে, দূর দূরান্তর থেকে তাঁর ডাক আসতে লাগলো। সানুচর কখনো তিনি যেতেন, কখনো যেতেন না। তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায়ও বাড়তে লাগলো। এবং এইভাবে তাঁকে কেন্দ্র করে একটি নাতিবৃহৎ গ্রামও গড়ে উঠলো, যার নাম হয়ে দাঁড়ালো গোপীবল্লভপুর।

এই 'গোপীবল্লভপুর' নামটি আজও ঠিক আছে, কিন্তু সেই অজ্ঞাত সামন্তরাজ নির্মিত বটগোহালীর পাষাণ-মন্দিরটি কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে!

বিপর্যয় আবার এসেছিল এইসব অঞ্চলে। প্রথম বিপর্যয় ঘটেছিল সোলেমান কর্‌রাণী যখন বাঙলার সিংহাসনে, সেই সময়ে। বাঙালী হিন্দু কালাচাঁদ ধর্ম পরিবর্তন করে 'কালাপাহাড়' নাম নিয়ে যে প্রবল ধ্বংসলীলায় রত হয়েছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার। যতো মন্দির তার সামনে পড়েছে, সব সে বিনা দ্বিধায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। বটগোহালীর মন্দিরটিও তাঁর করাল হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পায়নি।

তা-ও বা যতটুকু বাকী ছিল, ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল উন্মত্ত বর্গীর দল। গ্রামের পর গ্রাম আবার নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, মন্দিরের পাথর-রাশি ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল তারা,—তাদের হাত থেকে বটগোহালী গ্রামও বাঁচেনি।

'বটগোহালী' গ্রাম চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে গেছে। 'বট-গোহালী'র আশেপাশেও যেসব গ্রাম গড়ে উঠেছিল, তারাও বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে গাছপালা বেড়ে উঠে-উঠে সমগ্র অঞ্চলকে আবার পরিণত করেছে গহীন অরণ্যে।

সেই অরণ্যে কোথায় হারিয়ে গেল সেই বিশাল বটবৃক্ষ আর 'বামুন-পৈঠে'—কোথায় হারিয়ে গেল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, কে তার সন্ধান করবে?

আজকের দিনে এ অঞ্চলের অধিকাংশই 'জঙ্গল-মহাল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কিছু কিছু গ্রামও গড়ে উঠেছে এধারে-ওধারে। সুবর্ণখেরার দক্ষিণ-তীরে 'গোপীবল্লভপুর' এসে নদীতীর ধরে আরও কিছুটা পশ্চিম দিকে গেলে দেখা যাবে, বাঁ-হাতি কাঁচা সড়ক চলে গেছে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে উড়িষ্যার সীমানায়।

আর ঐ সড়ক ছেড়ে দিয়ে যদি সুবর্ণরেখার তীর ধরে ধরে আরও পশ্চিমদিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে 'টিকাইতপুর' 'পাইরাকুলি' প্রভৃতি ছোট-ছোট গ্রাম পড়বে পথে। 'টিকাইতপুর' 'পাইরাকুলি' এ-সব গ্রাম হচ্ছে আধুনিক পশ্চিম বঙ্গের সীমারেখায়, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পশ্চিমে বিহার। এসব গ্রামে যারা থাকে, তারা অধিকাংশই কৃষিজীবি, কিছু সাঁওতাল, কিছু 'লোধা'ও দেখা যায়। 'সাঁওতাল' 'লোধা' প্রভৃতিদেব বাদ দিলে, যারা এসব জায়গায় থাকে, তাদের কথাবার্তায় উড়িষ্যার টান বেশ লক্ষ্য করা যায়।

হয়ত-বা এইসব গ্রামেরই কোথাও দিব্যোর অতৃপ্ত-আত্মা আজও ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায় কেনারাম মোড়লের আত্মা। অথবা তাদের আত্মার তৃষ্ণা অন্য কারুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে সার্থকতার অনুসন্ধান করছে। নইলে, দরিদ্র কৃষিজীবীর ঘরে এমন ছেলে জন্মালো কেন, যার প্রবণতা পুতুল-গড়ার দিকে?—পট আঁকার দিকে?

বাপ মারা গিয়েছিল প্রায় ছোটবেলাতেই। আর মা গেছে বলতে গেলে এই সেদিন, মাত্র চারবছর আগে। মা চলে যাবার পর বন্ধন আর রইলো না। সুতরাং সে একদিন হঠাৎই বেরিয়ে পড়লো নিরুদ্দেশ-যাত্রাপথে। আর ফিরে এলো চার বছর পরে।

একটা লোক ডাকাতি করে দশ বছর জেল খেটে গ্রামে ফিরে এলে সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ে তাকে দেখতে। আবার কেউ-

যদি বিদেশে চাকরি করতে গিয়ে একদিন চলে আসে অনেক জিনিসপত্র কিনে, তখন তাকে দেখতে ছোটে সবাই। অথচ, সে যখন চারবছর পরে রিক্ত হস্তে ধীর পায়ে মাটিতে মিশে-যাওয়া নিজের কুঁড়েঘরখানার সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন গ্রামের কাকটাও 'কা-কা' করে ডেকে উঠলো না।

সে-তো ডাকাতি করে আসেনি, কিম্বা, বিদেশে চাকরি করে জিনিসপত্র টাকাকড়িও নিয়ে আসেনি, তাকে লোকে দেখতে আসবে কোন্ আনন্দে? যারা-যারা মাঠে কাজ করছিল, বা, পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তারা একটু মুখ তুলে, কিম্বা ঘাড় ফিরিয়ে, একবার ওকে চোখের দেখাটা দেখলো মাত্র, আর কিছুই না।

কুঁড়েঘরখানাকে 'ঘর' বললেও বেশী বলা হয়। মাটির স্তূপ। যাকে গ্রাম্যভাষায় 'পৈঠে' বা 'ভিৎ' বলা হয়, সেটি হাত চারেক উঁচু হবে, চতুষ্কোণ। সামনের কিছুটা অংশ আবার খানিকটা 'নাবাল' হয়ে আধ-হাত নীচু হয়ে এসেছে, যাকে 'দাওয়া' বলা যেতে পারে। দাওয়া থেকে ঠিক তার মাঝামাঝি জায়গায় ধাপ কেটে সিঁড়ি বানানো।

এবং এটুকু বোঝা যায় বলেই, একে একটা ঘরের ভগ্নাংশ বলে এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে, নইলে, কে বলবে এটি 'ঘর'?

কে বলবে, এই ঘরে সে মায়ের কোলে এসে চোখ মেলে তাকিয়েছে?

কে বলবে,—এই ঘরের দাওয়ায় বসে তার বাবা হুঁকোটা মুখের কাছে তুলে কাজকর্মের ফাঁকে একটু-আধটু জিরিয়ে নিয়েছে?

কে বলবে,—মাঠে একদিন 'রোয়া' ধানের কাজ করে ফিরে আসতে আসতে আল্-কেউটের কামড় খেয়ে এই দাওয়াতেই এসে শুয়ে পড়েছিল তার বাবা, আর ওঠেনি। চার বছর আগে ঐ ঘরখানার ভিতরেই তো কঠিন এক বুকের অসুখ নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল তার মা।

সেই ঘর—সেই দাওয়া কয়েকটা শাল আর বাঁশের খুঁটি বুকে নিয়ে শূন্যতায় হাহাকার করছে। চালের মূল কাঠামোটা আছে, দাওয়ার ওপরে তা-ও নেই। সেই ঘরের চাল-ছাওয়া শণ আর খড়। ভিটের বাইরেটা জঙ্গলে ভর্তি, মেঝেটা তো আগাছায় ঢাকা পড়ে আছে। দেখে-শুনে আশ্চর্য হতে হয়, শাল আর বাঁশের খুঁটিগুলো মানুষের লোভের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে কী ভাবে!

ভিটের অদূরে একটা চটালো পাথর মাটির ওপর মাথা তুলে আছে সেই মান্ধাতার আমল থেকে। ছোটবেলায় সে দেখতো, তার বাবা ওর ওপর নিজের হাতে ধানের গোছা আছড়াচ্ছে। ছোটবেলাকার শোনা বাবার মুখের সেই 'হেই-হেই' শব্দটা আজও যেন কানে এসে বাজে!

কিছুই কি হারায়? সেই ছোটবেলা—সেই পাঠশালায় পড়ার দিনগুলো—সেই গুপীনাথপুরে ভীম চতুর্দশীর মেলায় বেড়াতে যাওয়া বাবার কাঁধে চড়ে—সবই যেন বেঁচে আছে, কিন্তু কোথায় তারা আছে, এটুকুই জানা নেই। এ জানবার মন্ত্র তাকে কে বলে দেবে?

আস্তে আস্তে সে এসে বসলো আবহমানকালের সেই চটালো পাথরটার ওপরে। যেন স্মৃতিসমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। কয়েক হাত দূরেই একটা হরতুকীগাছ, তার গুঁড়ির একটা যায়গা দুটি পায়ে আঁকড়ে ধরে শক্ত ঠোঁট দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কোটর তৈরী করছে কাঠ-ঠোকরা পাখী। হাতের পুঁটলীটা পাশে রেখে সেদিকে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

কোমল রোদ্দুর ধীরে ধীরে একসময় 'খরা' হয়ে উঠলো। মাথার ওপরে ঝাঁকড়া-মাথা বুড়ো আমগাছটা ছাতার মতো ছায়া করে আছে। ছোটবেলায় বাবা বলতো,—বুড়োকে কাটতে মায়া করে, আমার বাপ-দাদাকে খাইয়েছে কম? এখন আর 'বউল' ফোটে না, ফল ফলে না।

ফল ফলতে কখনো সে দেখেনি গাছটায়। এক মানুষ সমান

মূল-গুঁড়িটার বেড় শ্যাওলা ধরে আছে, তার পরে, প্রকাণ্ড দুটো ময়াল সাপের মতো গুঁড়িটা দুভাগ হয়ে দুদিকে উঠে গেছে, কতো তাদের শাখা-প্রশাখা, কতো ডালপালা, কতো পত্রগুচ্ছ।

এদিকে বোধহয় কেউ আসেনা সচরাচর। এলে, পায়ে-চলার চিহ্ন ধরে ধরে একটা পথ-রেখা গড়ে উঠতো। এই যে বুড়ো আমগাছ, এর পাশ দিয়ে চলন-পথ ছিল একটা, তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের বিস্তৃত মাঠটার আলে গিয়ে পৌঁছতো। আল্ ধরে বড়ো রাস্তায় আজও লোকে আসে যায়, কিন্তু 'আল্' থেকে তাদের ঘর পর্যন্ত পায়ে-চলার রেখাটা ঘাসে-ঘাসে মুছে গেছে এই চার বছরে। শুধু দেখা যায়, সামনের ঐ হরিতকী গাছটার পিছন দিয়ে সরু একটা পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে মাঠের দিকে। পথটা নতুন, এই চার বছরের মধ্যে গড়ে উঠেছে। ঐ পথ ধরে কারা আসে-যায় কে জানে! গাঁয়ের একটা সীমানায় তার ঘর। গাঁয়ের ভিতর থেকে বাইরে বেরুবার বহু পথ আছে, সে-সব ছেড়ে দিয়ে এ-পথে যাতায়াত শুরু করলো কে, বা কারা? এমনও ত হতে পারে, শুধু একটি মানুষই ঐ পথে বারে বারে আসা-যাওয়া করে, আর আসতে যেতে থম্‌কে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে তার ভাঙা বাসাখানি দেখে হয়ত বা গোপনে একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কে জানে?

চুপচাপ তন্ময় হয়ে বসে আছে একভাবে, কাঠ-ঠোক্‌রার ঠক্ ঠক্-এর দিকেও তার মন নেই, সূর্য যে মাথার ওপরে উঠে এসেছে, সেদিকেও তার চোখ নেই, বুড়ো আমগাছটার পল্লবের দল বারবার মাথা নেড়ে বলতে লাগলো—উঠে যাও, আমরা আর তোমাকে পড়ন্ত শ্রাবণের খরা রোদ্দুরের হাত থেকে বাঁচাতে পারছি না। রোদ্দুর লেগে মাথা ধরবে, গা গরম হবে, জ্বর আসবে, তখন কোথায় থাকবে তুমি, কে তোমাকে দেখাশোনা করবে?

কিন্তু, ওর মন ততক্ষণে চলে গেছে সেই ওর ছেলেবেলায়। সুবর্ণরেখায় 'টুসু' ভাসান দিতে গিয়েছিল পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে তার মা। ছড়া গাইছিল সবাই, কিন্তু তার মায়ের গলা এত মিষ্টি

লাগছিল যে, বলার নয়। রাত্রে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে সে বলেছিল,—গাওনা মা আর একটিবার।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল তার মা, অদূরে মাদুরে-শোওয়া তার বাপের উদ্দেশে বলেছিল,—শুন্‌ছ? ছেইলা কী বলে?

বাবার চোখে ততক্ষণে তন্দ্রা নেমে এসেছে, কোনো সাড়া দিলো না। মা আবার হেঁকে বললে,—শুনলে না? আমার সাতরাজার ধন একটা মানিক, সে কী বলে, শুনলে না?

বাবা শুয়ে শুয়েই পাশ ফিরলো, ঘুম জড়ানো গলায় বলে উঠলো,—কী বলিসরে মানিক্য?

হঠাৎ এই সময় তার সমস্ত সত্বাকে নাড়া দিয়ে একটা ডাক ভেসে এলো,—মানিক্য?

চমকে তাকালো সে চারদিকে। মানিক্য বলে ডাকতো শুধু তার বাবা। আরও একজন তাকে ক্ষ্যাপানোর জন্য ডাকতো মাঝে মাঝে। কিন্তু আজ দীর্ঘ চার বছর পরে গ্রামে ফিরে এসে কার ডাক সে শুন্‌ছে এমন করে,—মানিক্য?

সে মুখ তুলতেই মানুষটি হরিতকী গাছের পিছন থেকে সামনে এলো, বললে,—চাঁদি যে ফাটলো হে রোদ্দুরে? উঠবে না? কুণ্ঠে ছিলে হে চারটি বছর? আইসো, চান-টান করে সুস্থির হয়ে নাও, খাওয়া-দাওয়া করো, তারপরে দুই সাঙাতে দুটি দা হাতে নিয়ে ঘর-দোর সাফ্ করতে লেগে যাই। বলি, ফিরে আইস্যেছো যখন, তখন ঘরে-দোরে বাস করতে হবে তো?

মানিক্য এত অবাক হয়ে গেল যে, কথাই বলতে পারলো না। হাঁ করে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। লোকটি এগিয়ে এসে ওর কাছে দাঁড়ালো একটু উবু হয়ে নিজের দুই হাঁটুর ওপরে হাত রেখে। ওর মুখের দিকে সোজা চেয়ে রইলো, বললে,—চেহারাখানও খাসা করে তুল্যেছ। কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে

উঠ্যাছে, গাল দুটো বইস্যে গেছে, চোখ ঢুক্যাছে কোটরে। এসব হইছে কাঁই? চারটা বৎসর খেতে-টেতে পাও নাই নাকি?

মানিক্য একটু অপ্রতিভ হয়ে চোখ নামালো, তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ধীরে ধীরে বললো,—আমার কথা থাক, তুমি কুথা থেকে, বর্জু?

লোকটা সোজা দাঁড়িয়ে তার চওড়া বুকের ওপর চাপড় দিয়ে বলে উঠলো,—বর্জু নয়—ব্রিজনারায়ণ। আজ বৎসর চারেক হলো, আমিও গেরামে যাতায়াত করছি। তুম্‌হি পালাইলে নিরুদ্দেশে, আর আমিও আইস্‌লাম। আইস্যে শুনি, তুমার মা মরছে, তুমিও কুথায় চইল্যে গেছ।

মানিক বা মানিক্য বললে,—সেই থিক্যা গেরামে বসবাস করছ ত?

বর্জু বললে,—কই আর করলাম। এই আসি-যাই তাঁতীঘরের মাকুর মতো। পরের ঘরের চাকুরী, বুঝ তো?

—কী চাকুরী?

বর্জু হাসলো, বললে,—আমার বিত্তান্ত শুন নাই? বিয়ার ছ'মাস পরেই ত পালাইলাম। বৎসর দুই খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ—শ্বশুর কাঁদে—শাশু কাঁদে—বউ কাঁদে—আমি পিট্‌টান—আমার খোঁজটা কেউ পালে না।

মানিক অল্প একটু হাসলো; বললে,—তা বটে। আমার মা তখনো বেঁচে, তোমার শাশু মার সখী ছিল ত, মার কাছে আইস্যা কাঁদতো, বলতো, সাধ কইরে 'ঘরজামাই' রাখলাম, তো জামাই হইল নিরুদ্দেশ।

বর্জু হাসতে লাগলো, বললো,—কাঁহা কাঁহা মুলুক ঘুরলাম ভাই, সে তুম্‌হি বিশ্বাস যাবে না।

মনটা স্বভাবতই ভার-ভার ছিল মানিকের, এখন ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অনেক হাল্‌কা লাগছিল। কিন্তু এমন কোনো কথা হঠাৎ না উঠে পড়ে যাতে ওর মন খারাপ হয়ে যায়, সেজন্যে

তাড়াতাড়ি সে জিজ্ঞাসা করলো, কুণ্ঠে-কুণ্ঠে ঘুরলে, একটু শুনি ?

বর্জু বললে,—পাহাড়ে পথ ধরে জঙ্গল পার হয়ে আগে গেলাম হাতিমারা, সেখান থেকে আরও হেঁটে গিয়ে সড়ক পাইলাম, কাঁচাসড়ক অবশ্য, সে সড়ক ধরে সোজা বারিপদা। বাঘে খাইতে পারত, ভালুকে তাড়া করতে পারত, কিন্তু তা করে নাই। বারিপাদায় গুটিয়ে মানুষের সঙ্গেরে আলাপ হইলে, গেলাম তার পাছু পাছু ট্রেনে চইড়ে সেই যাকে বলে বড়া শহর বালেশ্বর। সেখান থিক্যা ভুবনেশ্বর, তারপরে কটক, তারপরে কেউনঝাড়। জানলে হে, ছৌ-নাচের দলে ভীড়ে গিয়েছিলাম। এখন আমি রীতিমত নাচিয়ে। খৎ আসল্যেই চইলে যাই 'নাচ-গাওনা' করতে, তারপরে সেটা শেষ হইলে ফিরে আসি এই টিকাইতপুরে। দিনকতক থাকি, খাই-দাই-বেড়াই, আর তারপরে চল্যে যাই, ধরো কখনো মাসখানেক, কখনো বা মাসচারেকও হয়ে যায় ঘরে ফিরতে। কিন্তু আর কতো গল্প করবে হে, ইবার চলো, দেরী হইছে, ঘরওয়ালী রাগ করবে।

মানিক এবার প্রশ্ন করলো,—আমি যে এসেছি, তুমি জানলে কী করে ?

বর্জু বললে,—আমি আর জানবো কী করে ? আমার ঘরওয়ালীই বললে।

ভিতরে-ভিতরে চম্‌কে উঠলো মানিক। বর্জুর ঘরওয়ালী তাকে কখন দেখলো আসতে ? আর যদি দেখেই থাকে, স্বামীকে গিয়ে তার বলবার দরকার কী ছিল ? কী দরকার ছিল এই টান-পোড়েন করবার ? অবশ্য ঘর-তৈরীর প্রস্তাবটা লোভনীয়। ঘর তাকে তৈরী করতে হবেই, আর সেটা একা একা পেরে ওঠা সত্যিই সম্ভব নয়।

—কী মানিক্য, ভাবছো কী হে ? চলো ?

মানিক উঠে দাঁড়ালো, বললো,—ঘরটার অবস্থা দেখেছো ভাই ?

বর্জু বললে,—আমার ঘরওয়ালী সে হুকুমটাও দিয়েছে হে।

বললাম না খাওয়া দাওয়ার পর কাজে লেগে যাই? নাও এসো একা মানুষ, ভাত কোলে করে কতক্ষণ বইস্যে থাকবে।

—একা মানুষ মানে!

বর্জু বললে,—আমার শাশু মারা গেছে গত বছর। তার আগের বছর শ্বশুর। সংসারে আমরা মাত্র দুজন। গুঁড়াগাড়াও নাই।

মানিক অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো,—কী বুললে! মউসী নাই?

—নাই।

হাসি-হাসি মুখখানা মনে পড়ে গেল। তার মার কাছে আসতো, কতো গল্প করতো, কথা বলতে বলতে হাত নাড়তো খুব। কোনো-মানুষের উদ্দেশে কিছু বলতে হলে, মাথা কাৎ করে হাত মাথার কাছে তুলে একটি অদ্ভুত ভঙ্গী করতো মাসী।

—আঁই—আঁই—কী মনিষ গ! শাওন রোদ্দুরে পাগ্ মাথায় না দিয়া মাঠে মাঠে ঘুরছে কুচ্যা বকটির মতো!

নিজের স্বামীর সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি প্রায়ই করতো মাসী। কোচ্ বক মাঠে নামে খাদ্যের খোঁজে, অসীম ধৈর্য তার, শিকারের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে সে চুপচাপ—একভাবে। সেই ধৈর্যশীল খাদ্যসন্ধানী বকের সঙ্গে তুলনা দিতো মাসী আপন মানুষটির।

কিন্তু কোথায় গেল তারা? মাসীও নেই, মাসীর কোচ বক-ও নেই, তার বাবাও নেই, তার মা-ও নেই। একটা ভয়ঙ্কর অদৃশ্য ঝড় এসে যেন সেই অতীতটাকে মুহূর্তে মুছে দিয়ে গেছে,—ধান-কাটা মাঠের মতো শুধু স্মৃতির কাঁটা বুকে নিয়ে হাহাকার করছে বর্তমান,—আর কিছুই নয়!

—ভাম মেইরে গেলে যে হে! চোখ চাইয়ে একবার দেখে লাও।

বর্জুর কথায় চমক ভেঙে যায়। এতক্ষণে সে যে পুঁটলী হাতে বর্জুর সঙ্গে পথ হেঁটে বর্জুর উঠনে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা বুঝি তার হুঁসও নেই। সামনের দাওয়ায় হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে সে দেখলো,

সুগৌর সুডৌল একখানা চুড়িপরা হাত ঝকঝকে একটা পিতলের ঘটি রেখে ডুরে-কাটা খয়েরী একটা শাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গেই খয়েরী শাড়ীঘেরা ঘোম্‌টাটানা পুতুলটি দাওয়া থেকে ঘরের মধ্যে ত্বরিত পায়ে প্রস্থান করলো।

বর্জু বললে,—লাও হে সাঙাত, ঘটিভরা জল দেছে, মুখ-হাত ধুয়ে লাও। দাও দেখি পুঁটলীটা আমার হাতে। ভয় নাই, তোমার জিনিস আমার হাতে পড়লে খোয়া যাবে না।

মানিক কোনো কথা না বলে পুঁটলীটা ওর হাতে তুলে দিয়ে দাওয়া থেকে ঘটিটা নিয়ে মুখে আর হাতে-পায়ে জল দিলো। বর্জু করলো কী, দাওয়ার দড়িতেই ঝুলছিল লাল একটা গামছা, সেটি টেনে এনে ওর হাতে দিলো। সেই গামছায় মুখ মুছতে মুছতে মানিকের মনে হলো, সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ আছে ভিজে গামছাটার সঙ্গে মিশে। হেনা, না যুঁই,—কোন্ ফুলের গন্ধের সঙ্গে তুলনা দিতে পারা যায় এ'গন্ধের? কিম্বা, যুঁই-হেনার কোনোটিই নয়, অন্য ফুল? বকুল, পারুল, না, বেলিফুল?

বর্জু বললে,—লাও, ঘরে চলো এবার।

নিশ্চুপেই সে ঘরে ঢুকলো বর্জুর সঙ্গে। যে দরজা দিয়ে ঢুকলো, তার ঠিক বিপরীতেই ছিল অনুরূপ আর একটি দরজা। সেই দরজার ফাঁক দিয়ে মুহূর্তের জন্যে খয়েরী শাড়ীর আঁচলের একটি প্রান্ত দেখতে পেলো মানিক। ওদের আসতে দেখে তাড়াতাড়ি যেন ভিতরের দাওয়ায় নেমে গেল সে। সেখান থেকে গোবর-মাটি দিয়ে নিকোনো ঝকঝকে উঠনটায়, তারপরে উঠন থেকে রান্নাঘরে। কিন্তু তার সেই ছন্দোময় গতিভঙ্গী দেখতে পেলো না মানিক, কারণ, তার আগেই তাকে ঘরের ডানদিকে মাচার ওপর গিয়ে বসতে হয়েছে বর্জুর সঙ্গে।

মাচার ওপরে কাঁথা পেতে সামান্য উপকরণের বিছানা সাজানো। শাড়ীর পাড় জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা চাদর তৈরী করা হয়েছে, সে চাদরটিই মেলে দেওয়া হয়েছে বিছানার ওপরে, অতিথি-

অভ্যর্থনার ভূমিকা-স্বরূপ। লাল, নীল, গোলাপী, কালো,—নানা রঙের পাড়—কিন্তু প্রায় সব পাড়ই ফুল তোলা,—কোথাও তারা বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবু ত তারা ফুল ? ফুল-পাড় শাড়ীর দিকে আসক্তি আছে বোঝা যায়। কিন্তু কার আসক্তি যে কাজ করছে, তা বোঝা মুস্‌কিল। যে পরে তার ? না, যে পরতে দেয় তার ?

বর্জু একটুক্ষণ পরে বললে,—ভাবন কীসের এতো ? সেই থিক্যা চুপচাপ খালি ভাবতেছ কাঁয়, অ্যাঁ ?

অপ্রতিভের মতো উত্তর দেয় মানিক,—না ত, ভাবি নাই কিছু।

—ছাড়্যে দাও,—বর্জু বলে,—এই চার বছর তুমি কুণ্ঠে ছিলে, বল দেখি ?

হয়ত মানিক একটু ইতস্তত করবার পর শুরু করতো তার কাহিনী, হঠাৎ ভিতরকার দরজার কাছ থেকে শোনা গেল চুড়ির রিনিঝিনি। কলরব করে উঠলো বর্জু, বললে,—লাও সাঙাত, আর শুনা হলো না, 'সেতারে ঝালা পইড়্যাছে। উঠ, আসো দেখি রসুইঘরে।

এবারেও কোনো কথা নেই, ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গিয়ে তালপাতা বোনা আসনে বসলো দুজনে। বর্জু অদূরবর্তিনীর উদ্দেশে বলে উঠলো,—একগলা ঘোমটা দেছ কাঁই, ও বউ ? মানিক্য কি তুমার অজানা ?

কথাটা এমন কিছু নয়, এবং যাকে বলা, সে যতটা না লজ্জা পেলো তার থেকে বোধহয় বেশী লজ্জা পেলো মানিক, সে মাথা নীচু করলো। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তার মনে হলো, হয়ত ঘোম্‌টা-টা সে কপালের ওপরে তুলে দিয়েছে। আর, তারপরে কাঁসার একটা ঝক্‌ঝকে থালায় সুচারুরূপে বেড়ে দেওয়া ভাত তার সামনে এনে স্থাপিত করলো চুড়ি আর শাঁখা পরা সুগৌর দুটি হাত। হাত সরে গেল, আর তারপরে একটু মুখ তুলে সে দেখতে পেলো দুটি আল্‌তা-পরা পা, পা দুটির বুড়ো আঙুলে রুপোর আড়াই পেঁচি আংটা বসানো।

ফরসা ছোট দুটি আল্‌তা-পরা পা বার কয়েক আরও তাদের কাছে এলো, আর সরে গেল। বজু খেতে-খেতে বললে—লজ্জা করো কেন সাঙাত? ওরে কি তুমি চেনো না? বউ ঘোম্‌টা তুল্যাছে, তুমি আবার মুখের উপর অদিশ্য ঘোম্‌টা দিলে কাঁয়?

অতি নিকট থেকেই খিল্‌খিল্‌ অথচ চাপা হাসি শুনতে পেলো মানিক। বজু বললে,—ভালো করে খাও, হাই দেখ, বউ হাসছে তুমার কাণ্ড দেখে!

ভাত, ডাল, ভাজা, শুক্তো, আর বাটিতে মাছের ঝোল। খেতে খেতে একটু মুখ তোলে মানিক, অপাঙ্গে তাকাতে গিয়ে সেই আলতা-পরা পা দুখানি চোখে পড়ে, অদূরে একটি উঁচু পিঁড়ি পেতে বসেছে সে, হয়ত বা তার দিকে তাকিয়ে আছে। বজুর কথার উত্তরে রিনিঝিনি চুড়ি বেজে উঠলো আবার। চুড়িগুলি এবার যেন বলতে চায়,—কেমন মানুষ তুমি, অমন কথা বুইল্যা অতিথিরে লজ্জা দাও?

বজুর পক্ষে এ ভাষা বোঝাই ত স্বাভাবিক, সে বলে ওঠে,—না গ' লজ্জা কী? আমরা তুমার পর? হাঁ-ঘইর‍্যা মানুষ বটি, যোগাড়-যাগাড় করতে পারলাম কই? লজ্জা পাওয়ার কথা আমার, তুমার লয়।

—উ কথা বুল না ভাই,—মানিক বলে,—রাজার খাওয়া খাওয়াচ্ছো, চার বৎসর ই খাওয়া আমার কপালে জুটে নাই।

আল্‌তা-পরা মানুষটি বোধ হয় নিস্পন্দ হয়ে গেল কথাটা শুনে। কয়েক মুহূর্ত বজুও কথা বলতে পারলো না। মুখ তুলতেই এবার একেবারে চোখের সঙ্গে চোখ মিলে গেল মানিকের। তিলফুলজিনি নাসার ডগার দু'পাশে দুটি সাদা পাথরের বিন্দু ঝলমল করছে, বড়ো-বড়ো চোখ দুটি বিস্ফারিত, বাঁকা দুটি সুগঠিত ভ্রূ-ধনুর নীচে দুটি কালো চোখের তারা স্থির হয়ে আছে। ঠোঁট দুটি পাত্‌লা, পানের ছোপে ঈষৎ রক্তিম হয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি চোখ নামালো মানিক্য, বর্জু বললে,—চারটি বৎসর তাহলে তুমার কষ্টে কেটাছে, বল ?

—হুঁ, তা বলতে পার,—মানিক বললে,—আমি কলকাতা তক গিয়েছিলাম ভাই ঘুরতে ঘুরতে।

—কলকাতা!

—হুঁ।

—কী রকম দেখলে ? খুব বড়া শহর বটে ?

—হুঁ, তা হবে। জন খেটেছি, মজুরের কাজ করেছি, কিন্তু 'শিল্পকম্ম' শিখাটা হইল নাই।

—কী 'কম্ম' বুললে!

মানিক বললে,—শিল্পকম্ম। পট আঁকার ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থিক্যা, তুমি জানতে নাই ?

বর্জু এ-গ্রামের জামাই, সে মানিকের ছোটবেলার খবর জানবে কতটুকু ? উত্তর এলো ঘরের অপর প্রান্ত থেকে। ফিস্‌ফিস্‌ করা চাপা স্বর হলেও চেনা যায়,—পট শিখা আর হইল কই ?

মানিকের মুখখানা স্বাভাবিকভাবেই ঘুরে গেল তার দিকে। দুটি চোখে মৃদু তিরস্কারের ছায়া নেমেছে ঠোঁটের প্রান্তে কুঞ্চন জেগেছে, সাদা পাথরের বিন্দুতে আলোর ঝিলিক!

বর্জু বললে,—তারপর ?

মানিক নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ ফেরালো বর্জুর দিকে, বললে,—মনটার মধ্যে একটা ইচ্ছা আঁকুপাঁকু করতো হে! যিমন কইরে পারি ভালো মতন পট আঁকাটা শিখে নুবো। তা অদিষ্টে হইল নাই।

—কাঁয় ?

—তিমনটি মানুষ পাইলাম কই, যে শিখ্‌বো ? শেষ পর্যন্ত ভগবান নাগাল দিলেন্‌ অন্য একটা শিল্পকম্মের।

—সেটি কী হে ?

মানিক বললে,—গুটিয়ে বুড়া মানুষ গঙ্গাসিনানে আইস্যেছিলেন, আমার সঙ্গেরে হঠাৎ কথা হই গেল। শুধালেন, বাড়ি কুণ্ঠে? বললাম,—টিকাইতপুর। তিনি বুললেন,—সিটি কুথা? বুললাম,—জিলা মেদিনীপুর বটে। তিনি বুললেন,—আমার বাড়িটোও মেদিনীপুর, খাস শহরে বটে, কাঁসাই নদীর কোল ঘেঁষে। তা টিকাইতপুর শহর থিক্যা কতদূর? বুললাম,—সিটি বুলতে লারব, তবে, ঝাড়গ্রাম চিনেন কী? তিনি 'হুঁ' বুলতেই আমি সম্ঝাই দিলম। বুললাম,—চইল্যে আসেন লোধাশুলি, লোধাশুলি থিক্যা বেশ কয়েকটি ক্রোশ হবেক—মনে করি পচ্চিম দিক—সুবর্ন্নরেখা নদী পড়বেক—সিটি পার হইলেই গুপীবল্লভপুর। গুপীবল্লভপুরের কিছু পচ্চিমে টিকাইতপুর—ওড়িষ্যাদেশের লাগোয়া বটেক। তিনি বুললেন,—সিটি বুঝা যায় তুমার কথাটি শুন্যে। তা কাম করবেক আমার বাড়িতে। 'হুঁ করব' বুলে তাঁর সঙ্গেরে গেলাম। মানুষটি কারিগর বটে। মাটি দিয়ে হাজার দ্রব্য গইড়ে দেয়। এই পুতুল গইড়ছে, এই ঠাকুর গইড়ছে—নানান রকম। গড়া দেখতে দেখতে আমারও সখ হইল ই শিল্পকম্মটি ভালো কইরে শিখ্বার।

বর্জু নিবিষ্ট মনে শুন্ছিল, প্রশ্ন করলো,—শিখলে?

মানিক বললে,—সামান্য।

—তা চইলে আলে কাঁয়?

মানিক বললে,—বুড়া চোখটি বুজলে। বুড়ার ছেইলেরা বাপের জিনিসপত্তর নিয়া আকচাআকচি বাধাইলে, আমারেও কাম থিক্যা ছাড়াইলে। থাকুব কুথাকে বল?—উয়ার নাম কলকাত্তা শহর—কড়ি ছাড়া গুটিয়ে পা-ও তুম্হি চলতে লারবে। তা বল, কড়ি আমি পাব কুথা? বুড়ার সঙ্গেরে ছিলম পেট-ভাতায়। তাই চইল্যে এলাম আপন গেরাম পাখেরে। মন্দ কইরলাম?

বর্জু বললে,—না না, তা কেন? ইটা কী বুলছ? ঘর তুইল্যে দি, থাক তুমার গেরামে, সুখেদুখে দিন কেটে যাবেক।

কিন্তু, ঘর গড়তে চাইলেই কি মানুষ ঘর গড়তে পারে? কাজটা

যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, তত সহজ নয়। সারাটা দিন শুধু জঙ্গল সাফ করতেই কেটে গেল। ভাঙা চালের অংশ আর আগাছার হাত থেকে শুধু ভিটের ভিৎটাকে উদ্ধার করতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। তার মধ্যে বিপদও গেল কম নয়। একটা ক্রুদ্ধ খারিশ ফোঁস করে ফণা তুললো, কাছেই ছিল বর্জু, চট্ করে সরে না গেলে কী হতো কে জানে। খারিশটা অবশ্য তার পরেই ফণা নামিয়ে ভিটে ছেড়ে সামনের মাঠের দিকে সোজা দৌড় দিলে। মানিক কাছে এসে বললে,—সব্বনাশ। যদি কাটতো?

বর্জুর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সে-ভাবটা একটু সে সামলে নিয়ে বলে উঠলো,—কাটবে কাঁয়? মঞ্জরীর সিঁথির জোর আছে হে।

বর্জুর হাতখানা চেপে ধরে মানিক বলে,—কাজ নাই। যদি আরও থাকে?

বর্জু একটু হাসে, বলে,—থাকবে বুলে কি ঘর উঠাতে হবেক নাই? লাও, দা-খানাকে শক্ত করে ধরো, গুরুর নাম নিয়া চালু করো কাম।

কাজ করতে করতে একটা নাম মনের অগোচরেই বুঝি অন্তরে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। মঞ্জরী! মঞ্জরী নাম ত ছিল না? ছোটবেলায় ওকে ত 'পটু' বলে সবাই ডাকতো, নাম ছিল— পটেশ্বরী। মাসীর সঙ্গে তাদের ঘরে আসতো, তবে ছোট থেকেই বড়ো লাজুক-লাজুক, হুটোপাটি ছুটোছুটি করতে বড়ো একটা সে দেখেনি ওকে। আর তাছাড়া, গ্রাম বলে কথা। এখানে মেয়ে ন' দশ বছরে পড়তে না পড়তেই বাপ-মায়ের শাসন শুরু হয়ে যায়। মাসীর কুচ্যা বক, অর্থাৎ, পটুর বাপের গোপন শখ ছিল পট আঁকা। সেই পট-আঁকার ইচ্ছা থেকেই কি তিনি মেয়ের নাম রেখেছিলেন,— পটেশ্বরী?

ছিপছিপে গড়নের পটেশ্বরীকে মাঝে মাঝে দেখা যেতো, ডুরে লাল শাড়ী পরে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় যাতায়াত করছে।

ওকে দেখতে পেলেই মুখ টিপে হাসতো, বলতো,—কুণ্ঠে যাও মানিক্য ?

'মানিক্য' বলে বাবা ছাড়া অন্য কেউ ডাকলে ভিতরে ভিতরে রেগে উঠতো মানিক, কিন্তু মুখে সে তা সহসা প্রকাশ করতো না। মেয়েটা কিন্তু সব বুঝতো, তাই সুযোগ পেলেই ডাকতো,—মানিক্য!

সেই 'মানিক্য' ডাকের স্মৃতি আজ মধুর হয়ে কানে বেজে ওঠে মহাকালের সমুদ্র পেরিয়ে। মনে হয়, আজ যদি কোন শুভক্ষণে সে শুনতে পায় ঐ ডাক ? আজ সে রাগ করবে না, আজ সে মুখ নীচু করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে না।

পটু ডাকলো না বটে, কিন্তু পটুর স্বামী তাকে ডেকে উঠেছিল মানিক্য নামে। বর্জু ত জানতো না তার এই নাম। বর্জুর মঞ্জরী বর্জুকে কি বলে দিয়েছিল এই নামে ডাকতে ?

—হাই দেখ, দা হাতে নিচ্চুপ হইয়ে কী ভাব্‌ছ গ আবার ?

অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি আবার কাজ শুরু করে মানিক।

ওরা কাজ করছে, আর ওদিকে গ্রামের আনাচে-কানাচে কথা কানাকানি চল্‌তে থাকে। মানিকের বাবার নাম ধরে বুড়োরা সব বলাবলি করে,—অমুকের পোয়া (ছেলে) না ? চার বৎসর পরে ফিরে আইল কেনে ?

—বসত করবে লাগছে।

—কেনে ?

—ই দেখ, বাপ-মার ভিটা, পো আসবেক্ নাই ?

—তেবে করবেক কা ইখানে ?

—হঁ, সি গুটিয়ে কথা বটেক। উয়ার ত ক্ষেত-খামার নাই। বাপ থাকতেই মহাজনের পেটে গিইছে সি-সব, মা-বিটি কাঠ-কুঠ্‌রো কুড়ায়ে দুঃখে-ধান্দায় পোটারে মানুষ করেছিল।

—সিটিই ত শুধাই। উ ইখন করবে কী ? খাওয়াবে কে উয়াকে ?

—কে খাওয়াবে ? গতর।

—গতর নাই হে। বাপটার মতন খাট্‌তে পারত নাই। লগ্‌বগা শরীল ছিল দেখ নাই ?

—কিন্তুক্‌, উয়ার পাখেরে বর্জু নটুয়াটা গিয়ে জুট্‌লো কাঁয় হে ?

—কে জানে। বর্জু উয়ারে খাওয়াইছে, নিজের হাতে ঘর বানাই দিবে বুলে বুল্‌ছে।

—বোঝা ভার।

—আগ্‌-পারা বউ ঘরটিতে, বর্জু যেন সাম্‌লে চইল্‌বার চেষ্টা করে।

—আরে দূর, উয়ারে ভয় কী ? সাত চড়ে রা কাড়ে না মানিক, —উ আবার সিখানে কী করবে ?

এইসব কথাবার্তা এদিকে-ওদিকে চলতে থাকে ক'দিন ধরে। ওকে নিয়ে ওরা আলোচনা করে, অথচ কেউ যে ওর কাছে গিয়ে ওর কুশল জিজ্ঞাসা করবে, এমন উৎসাহ দেখা যায় না। গ্রামের এ-পাড়ার সবাই খুব গরীব, নিজের বলতে একফালি-দু'ফালি চাষের জমি হয়ত কারুর আছে, কিন্তু তা-ও নানান কারণে মহাজন-কবলিত। আগে আগে মহাজন বলতে একটি মানুষকেই বোঝাতো, যেমন অর্জুন টিকাইত, কি অযোধ্যা সড়ঙ্গী। কিন্তু, আজ আর তারা নেই, আজ মহাজন বলতে একটি মানুষ নয়, একটি মণ্ডলী বোঝায়। পঞ্চায়েত বা মণ্ডল-সভা গোছের একটা কিছু আছে, কিন্তু হরি টিকাইতের ভাষায়,—হরে-দরে কাশ্যপগোত্তর—ওই একই কথা। কর্জের খুঁটিতে গরুর মতন তুমি ত বাঁধা থাকলে হে।

হরি টিকাইত ওদের পাড়ার কেউ নয়, মাথায় টিকি রেখে চাদর গায়ে-হাতে পিতলের ছোট্ট ডালিতে ফুল-চন্দন নিয়ে বেড়ায়। এ-পাড়া সে-পাড়া ঘুরে বেড়ানোই তার প্রতিদিন ভোর বেলাকার কাজ। বলে,—পাতঃকালে মাঠে নামবার আগে ঠাকুরের পেসাদী ফুল লাও হে, আর পারো ত, দশ নম্বরী একটা পুইসা দাও।

আগে-আগে তার প্রার্থনা ছিল পাঁচ পয়সার, কিন্তু এখন সেটা একটু বেড়ে গেছে।

—লয়া পুইসার আমল, বুঝলে হে? সাবেক পাঁচ পুইসার হিসাব-কিতাব তুমরা করতে লারবেক, তার থিক্যা দিয়া দাও হরির নামে ঐ একটা চাকতি, যাকে তুমরা বুলবে দশ লয়া পুইসা।

এ হেন হরি টিকাইত একদিন আর থাকতে না পেরে ঘুরতে ঘুরতে বর্জুর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালো। ডাক দিলে,—আছো হে নটোমহাশয়?

বর্জু ছৌ-নাচের দলে নেচেগেয়ে পয়সা আনে বলে তাকে মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন পরিহাসের সুরে হরি টিকাইত বলে,—নটোমহাশয়। কখনো বা বর্জু নটুয়া। আর কোনো কিছু সাহায্য পেতে হলে বলে,—ব্রিজনারায়ণ।

হরি টিকাইত কোনো সাড়া পেলো না। না পেয়ে এবার একটু জোরেই ডেকে উঠলো,—বর্জু হে—বর্জু?

দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো খয়েরী শাড়ী-পরা মঞ্জরী, মৃদুকণ্ঠে বললে,—ঘরকে নাই বটে। আপনে পসাদী ফুল স্থান জ্যেঠামশায়।

প্রায় দন্তহীন মুখে আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি ফুটে ওঠে প্রৌঢ় হরি টিকাইতের। বলল,—মা-লক্ষ্মী ভেন্ন বুড়ার কষ্টটা বুঝবে কে? লাও মা প্রসাদী—এই লাও তুলসীপাতা—এই লাও ফুল।

প্রসাদী নিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে মঞ্জরী, তারপর আঁচলের খুঁট থেকে দশ নম্বরী একটা রূপালী মুদ্রা বার করে টিকাইতের হাতে দেয়। টিকাইত পয়সাটা ট্যাকে গুঁজে রেখে ধীরে ধীরে বলে,—ঠিক ই ব্যাপারটির জন্য আসি নাই বটে। বর্জু গেল কুণ্ঠে—এই সাত-সকালে?

মুখ নীচু করে মৃদু মৃদু হাসে মঞ্জরী, বলে,—উয়ার সাঙাতের ঘর।

—সাঙাতটি কে বটে?

মঞ্জরীর পদ্ম-পাপড়ি ঠোঁটে এবার টুকরো হাসিটা ছড়িয়ে পড়ে, সে বলে,—মানিক্য।

হরি আসলে এসেছিল এইসব খবরই নিতে, তাই একটু উৎসাহিত হয়ে বললে,—'হা-ঘরেটা'র সঙ্গেরে সাঙাতি হইল বর্জুর ?

—হইল ত।

হরি বললে,—বর্জু ঘরামীর কাজ জানে। তেবেই ত উয়ার ঘরটা তুইল্যা দিলে। কিন্তুক কথাটা হইছে, ঘর তুলবার ট্যাকা আছে ত মানিক ?

—কই আর আছে ?—মঞ্জরী মুখ তুলে তাকায় হরির দিকে, বলে,—জমানো খড়কুটাও সাঙাতের ঘরের কাজে লাগাইছে।

—তুমি দিলে কেনে ?

মঞ্জরী বলে,—ই দেখ, কী কথা বুলছেন আপনে, জ্যেঠামশায় ! আমার ঘাড়টিতে কটা মাথা যে, মানা করব ? মানা আমার শোনে ? বলে,—ঘ্যান-ঘ্যান করবে ত, নাচের দলে চইলে যাবু।

হরি বলে,—নাচের দলে ত আছেই সে। না, কী ?

মঞ্জরী বলে,—সত্য কথা। কিন্তুক, উয়াকে ত জানেন, হাতে কিছু পুইসা জমলেই দল ছাইড়ে চইলে আসে। তারা খতের পর খৎ লিখে, তেবে মন হয় ত যায়। মন হইলে বলে,—ঘরামীগিরি করবু, ঘর ছাইড়ে যাবু না ! আবার মন হলে বলবে,—চললুম গো বউ, নাচের দলে। খৎ লিখ্যাছে উয়ারা। বইলে, মাথায় চাদরটি দিয়া পাগ্‌ বাঁধবে, আর লাঠি হাতে, পুঁটলী কাঁধে সটান রওনা হই যাবেক, তেখন তুমি কাঁদো-কাটো, পিছুটি ফিরা তাকাইবে না।

হরি শুনে মাথা নাড়ে, বলে,—হুঁ, নাটোমহাশয় মেজাজী মনিষটি আছেন বটে।

মঞ্জরী অভিযোগের সুরে বলে,—দেখেন না কেনে জ্যেঠামশায়, সাঙাতের পাঁচ-পাঁচটা দিন ঘরকে রাখলে, খাওয়ালে দুটি বেলা কইরে। হাতে পুইসা নাই কড়ি নাই আমি কী-টা করি, লতুন মনিষটিরে কিমন করে ভাত বেড়ে দেই ?

—তারপর ?

মঞ্জরী বলে,—কর্জ করলু প্রধান খুড়ার ঘর থিকা। বুললাম,—খুড়ীমা, মান যায়, তুমি দাও পাঁচটা ট্যাকা। তা খুড়ীমা বুললে,—ট্যাকা দেই, কিন্তুক, 'হা-ঘরেটারে' ঘরে-দুয়ারে রাখিস না মা। ই দেখ জ্যেঠামশায়, আমার কপাল। আমি তারে রাখি। তুই সাঙাতে ভিত্‌রি দাওয়ায় চাটাই পেতে শোয়, আমি মেইয়ামানুষ, একা ঘরে ডরে মরি।

—কেনে ?—হরি বলে,—সুখীর মাকে ডাকিস না কেনে ?

সুখীর মা পাড়ার একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক—বিধবা। সুখী বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে বিয়ে দিয়েছিল সেই রোহিনী গ্রামে, গোপীবল্লভপুর আর তারপরে পাটনা গ্রাম ছাড়িয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে যেতে হয়। কিন্তু বিয়ের পর মেয়েকে আর পাঠায় না শ্বশুরবাড়ি থেকে, মা থাকতে না পেরে মাঝে মাঝে জামাইবাড়ি চলে যায়, দিন দুই কাটিয়ে আবার ফিরে আসে। এই সুখীর মা যাকে বলে 'খাটিয়ে মেয়েমানুষ'—কাজ ছাড়া থাকতে পারে না, গৃহস্থের পালপার্বনে দায়ে-অদায়ে ঠিক গিয়ে পড়ে। কোথাও পয়সা পায়, কোথাও চাল-ডাল পায়, কোথাও কিছু পায়ই না। সুখীর মার তাতে মুখ ব্যাজার নেই, হাসি মুখেই ঘুরছে। শুধু প্রশ্রয় পেলে একটু গল্প করে, একটু বেশী বকে। অন্য কিছু নয়, ঐ মেয়ের গল্প। এবং খুব অন্তরঙ্গ হতে পারলে আরও একটি কাহিনী বলে, যা তার নিজের কিশোরী-বয়সকালের ঘটনা, বলতে বলতে আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে, চোখে জল দেখা দেয়। এ-হেন সুখীর মা জামাই না থাকলে ডাকামাত্রই মঞ্জরীর ঘরে এসে উপস্থিত হয়। এসে আর দেরী নয়, সঙ্গে সঙ্গে হাতে তুলে নেয় সব গৃহকাজ, মঞ্জরীকে বলে,—তুই একটু জিরান্ নে দেখি। আমার সামনে খেটে মরবি, আর আমি তা চোখ চেয়ে দেখবু ? মরণ নাই মোর ? তুই আমার সুখীর থিক্যাও ছোটটি বটে, আমার ছোট মেইয়ে তুই।

সুখীর মায়ের কথা [illegible]ায় মঞ্জরী হরি টিকাইতকে বলে,—ইটা কী বুলছেন জ্যেঠামশায়, আপনের জামাই ঘরকে থাকতে সুখীর মা আসবে কেনে ?

—আচ্ছা, সি কথাটি যাক,—হরি বলে,—মানিকের কথা বল্ দেখি। উ কি গেরামে থাকবেক ?

—বুলছে ত।

—করবে কী ? খাবে কী কইরে ? তুয়াদের নয় ছিটা জমিন্‌টুক্ আছে, খাট্‌লে-খুটলে ধান-পান কিছু ঘরকে আসে, কিন্তু মানিকটা করবে কী। উয়ার ত জমিন নাই—কিছু নাই।

—সত্য কথা।

হরি বলে এবার নীচু গলায়,—হঁ মা, উয়ার ট্যাকা আছে মনে লয় ?

মঞ্জরী বলে,—না জ্যেঠামশায়, ট্যাকা থাকলে খড়টা কিন্‌তো, বাঁশটা কিনতো, ঘরামীর হাতেও দুইটা একটা দিতো। উয়ার কিছু নাই বটেক, পেট চলা দায় হবে।

মানিকের পেট-চলার ব্যাপার নিয়ে হরির মাথাব্যথা ছিল না, সে যেটা প্রকৃতপক্ষে জানতে এসেছিল, তা তার জানা হয়ে গেল। এক কথায়, মানিকটা যে সত্যিই হা-ঘরে—এটা বুঝতে কষ্ট হলো না। ওর হাতে গোপন টাকা-পয়সা তাহলে সত্যিই নেই। এমন কি, এখন প্রসাদী ফুল নিয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে হয়ত দশটি পয়সাও ও হাতে তুলে দিতে পারবে না।

হরি এখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে আবার বুড়োদের সঙ্গে একে-একে সাক্ষাৎ করে।

দূর থেকে ঐ যে চালাটা দেখা যায়, ওটা মানিকের বটে, কিন্তু বর্জু নটুয়া যদি সাহায্য না করতো, তাহলে কি ওটা ও তুলতে পারতো ? শুধু গতর দিয়ে সাহায্য নয়, খড়, বাঁশ, দড়ি-দড়া, দর্‌মা,—একটা ঘর তুলতে দব্য কি লাগে কম ? আপনারাই বিবেচনা করে দেখেন। এতো আপনাদিগেরই আপন পাড়ার কথা। শাওন

মাস, ঝড়-বাদলা লেগেই আছে, ঘর না তুলতে ছেলেটা আপনা-দিগেরই কারুর আশ্রয়ে এসে উঠতো। তখন? এ এক রকম ভালো হলো। যা শত্তুর পরে পরে। কিন্তু, এখন করবে কী ছেলেটা? বর্জু নটুয়া ওকে ত আর চিরটা কাল বসে বসে খাওয়াতে পারে না? আর খাওয়াবেই বা কী করে? ওদের হালও ত জানতে কারুর বাকী নেই। নেচেকুঁদে ছোঁড়াটা আর ক'পয়সা ঘরে আনে? তখন সুখীর মার সঙ্গে মিশে মেয়েটা ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চাল-চিঁড়ে কুটে গতর খাটানোর জন্য যে একটু-আধটু-পয়সা পায়!

বর্জু কিন্তু ওদিকে মানিক্যের কাণ্ড দেখে সত্যি সত্যি অবাক হয়ে যায়। তাই সে মাঠের কাজ ফেলেও ছুটে আসে ওর ঘরে। বলে,—কেতে দূর হইল হে?

—এই হইল।

বর্জু তাকিয়ে তাকিয়ে মানিকের কাজ দেখে, কেমন নেশা লেগে যায়। বলে,—তুমার শিল্পকম্ম আমারেও একটু শিখাও না কেনে?

মানিক হাসে, বলে,—তুমি বড় ছট্‌ফটান্যা আছ হে সাঙাত, তুমি ই কাম পারবে নাই। ই হইছে ধইরে-বইসে মন লাগানো কাম। মন ছুট্‌ হইছে ত, কামের দশাও খতম।

বর্জু বললে,—ইটা মন্দ বল নাই। আমার টুকু মন-উচাটন ধরণটি আছে বটেক। এক কাম এক ভাবে বইস্যে বইস্যে করবু, সিটা মনে লাগে নাই। ঠিক আছে, তুমি কাম কর আমি দেখি। গুপীবল্লভপুরের মেলায় খুব বিকাবে হে, তেখন আর একটা চালা উঠানো যাবেক্‌, কী বল?

মানিক বলে,—তুমার কর্জের ট্যাকা আগে শুধ্যা লই ভাই। কথায় বলে, ট্যাকার ঋণ শোধ হয়, ভাবের ঋণ শোধ হয় না। ঋণী তুমার কাছে থাকবুই। তেবে, ভাবেই থাকবু, ট্যাকায় লয়, কী বল?

বর্জু বলে,—বুললে খুব! ই যেন লাখ-পঞ্চাশ দিয়াছি হে!

মানিক বলে,—যে ট্যাকা দিয়াছ, উয়াই আমার ইখন লাখ-পঞ্চাশ। এক কুড়ি ট্যাকাটা কি কম হইল ভাই?

—উয়া ত সাকুল্যে ধরলে, নগদ নিছ ত পাঁচ।

—কেনে? খড় দিলে, তার দাম নাই? বাঁশ কাটি আনলে ঝাড় থিক্যা, তার দাম নাই? দড়ি-দড়া কিনলে, তার দাম নাই? দু' চারট্যা কাঠ আনলে ঘর থিক্যা, তার দাম নাই? সব মিলাইলে এক কুড়ির কম হবেক নাই।

এবারে হাসলো বজু হো-হো করে, বললে,—আমি যাবু যখন বিদেশ-বিভূঁই লাচ করতে, আমার পরিবারের হাতে তেখন তুইল্যা দিও। আমি না থাকলে উয়ার বড় কষ্ট হয়। পরের ধানে 'ঢিঁকি-পাড় দিয়া উয়ার দিন চলে হে সাঙাত।

হাতের কাজ থামিয়ে রেখে ওর দিকে নির্বোধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মানিক্য, কিছু বলতে পারে না।

বজু আকাশের দিকে তাকায় ওর ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে। বলে,—আকাশে মেঘের গতিক ভালো লয়। ইটা ঝুম্-ঝাম্ শাঙনের মেঘ লয় হে, ইটা গরীব-ঘরের বুক কাঁপাইন্যা মেঘ। সামাল ভাই। চাল না উইড়ে যায়। আমিও ঘর যাই—বউটা একা রইছে, ডর পাবে।

বলতে বলতে বজু উঠে পড়ে, তারপরে ত্বরিত পায়ে বেরিয়ে চলে যায়।

পিছনে-পিছনে মানিকও এসে দাঁড়ায়। আকাশটা কালো হয়ে এসেছে, দূরে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে আকাশ জুড়ে, ছোট ছেলে কাঁদলে যেমন চোখের কাজল মুছিয়ে দিয়ে ধারা নামে, তেমনি করে দিগন্তে কালো মেঘের কালো কাজল মুছিয়ে দিয়ে ধারা নেমেছে। কালো কাজল গলে পড়ে পড়ে দিগন্ত বৃষ্টির ধারায় ধারায় শুভ্রতায় পরিণত হচ্ছে।

ঐ বৃষ্টি দেখতে দেখতে কাছে এসে পড়তে পারে, আবার দুরন্ত হাওয়ার বেগে অন্যদিকেও উড়ে যেতে পারে। মানিক চিন্তিত হয়ে

নিজের ঘরের দিকে তাকায়। তার ঘরের দরজা বলে কোনো বস্তু নেই, দরমা দিয়ে একটা ঝাঁপ মতো করা হয়েছে, সঙ্গে একটা পুরানো শিকল আর আংটা, তা-ও জোগাড় করে দিয়েছে বর্জু, তাইতে তালা দেওয়া যেতে পারে দরকার হলে। চালে খড় কম, হাওয়ায় এদিক-ওদিক হলে বৃষ্টি পড়ে ঘর ভেসে যেতে পারে। তার দরমার ঘরে দরমা কেটে গোটা দুই জানালা করা হয়েছে, তা-ও ঝাঁপ বন্ধ করার ব্যবস্থা। হাওয়া দিলে ঝাঁপ দুটি নড়তে পারে, তখন সেখান দিয়েও জল এসে পড়তে বাধা কী?

যে-কদিন হলো সে গ্রামে এসেছে, এ-কদিন শ্রাবণ মাস হলেও তেমন বর্ষা নামেনি, দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে মাত্র। সে বৃষ্টিতে শালিকগুলো মহানন্দে ভিজেছে, কলরব করেছে, গ্রামের লোকেরা মাথায় টোকা না বসিয়েও রোয়া ধানের ব্যবস্থা করতে মাঠে নেমে গেছে। অধিকাংশই ভাগীদার চাষা, চাষ করবার দরুন ফসলের একটা অংশ পায় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের এই অঞ্চলটা গরীবদের বাস, চারদিকে মাঠ আর মাঝখানে একটা দ্বীপের মতো গোলাকার যায়গায় ওরা বাস করে, সবাই ওরা চাষী, বৃষ্টি না হলে দুশ্চিন্তায় সবার চোখ থেকেই ঘুম চলে যায়, আবার বেশী বৃষ্টি হলে দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। বাঙলাদেশের নিম্নাঞ্চলের সঙ্গে এদের হুবহু মিল নেই, এদের চাষের সমস্যা একটু ভিন্নতর। প্রথমত বর্ষার ধরনটা এখানে একটু বিশিষ্ট রূপ নেয়। বর্ষাকালেও ক্রমাগত কদিন খরা চলতে পারে, আর ঢল যদি নামলো, এমন প্রবল আকার তা সময়ে-সময়ে ধারণ করে, যে মাঠের পাশ দিয়ে যে নালাটা বয়ে যায় সেটাও সংহার মূর্তি পরিগ্রহ করে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, প্রবল স্রোত পেরিয়ে চাষীরা আসতে পারে না। অন্য দিক দিয়ে অনেক ঘুরে তবে তাদের ঘরে ফিরতে হয়। দ্বিতীয়ত, মাঠ তাদের সমতল নয়, উঁচু নীচু দিগন্তে পাহাড়ের শ্রেণী। তাই, ধাপ-কাটা জমিন এখানকার, এর জমির জল ধুয়ে ওর জমিতে আসে। সেজন্য জমিনের আল-বন্ধন নিয়ে সাবধানতার সীমা নেই। প্রায়ই শোনা যায়—অমুকের

আল কাঁইসে গেছে হে, ত্বরিত চল। আল্ বাঁধতে হবেক্, চারায় গত্তি লাগেনি, এরই মধ্যে যদি জলটুকু জমিন্ থেকে নাম্যে যায় ত, সব্বোনাশ! আকাশ ত লয়, যেন, নীল সমুন্দুরে সাদা পালতোলা লৌকো ভাসছে। কবে ঢল নামবে, কে জানে!

সেই নীল সমুন্দুরে সাদা পালতোলা নৌকোরা উধাও হয়ে গেছে, সেখানে এখন জলভরা কোলে সোনার ছড়াছড়ি। কালো মেঘ ওদের কাছে একদিক দিয়ে 'কেলে সোনা'র সামিল। সেদিকে তাকিয়ে টোকা মাথায় কৃষকের দল হাসি-তামাসা করে, বলে,—রাই কিশোরীরে দেখতে আইস্‌ছে হে, কেলেসোনা। কিন্তু রাই ইখন কিশোরী, উয়ার সোনার অঙ্গ সোনা হইতে দাও? ত্বর সয়না গ, পিরীতের রীতিই হইল এই।

আজ কিন্তু হাওয়ার গতি দেখে ওদের বুক শুকিয়ে যায়। তবু একজন হয়ত বলে,—কেলেস্যোনা আজ রাগ কর্‌ছে গ!

অন্যজন বিরক্ত হয়ে বললে,—চুপ দে, রঙ্গরসের সময়টা খুব বেছেছিস! ঘরের চাল উড়িয়ে নেয়, কী মাঠের চারা উপড়ে দেয়, তার ঠিক নেই, উনি আইস্‌লেন বিন্দাদূতী হয়ে!

এ-সব কথা ওরা চেঁচিয়েই বলে। না বলে উপায়ও নেই; এ-মাঠের লোক ও-মাঠে লোকের সঙ্গে কথা বল্‌ছে যে! আর, সেই সব কথা বাতাসে কেঁপে কেঁপে মানিকের কানে এসে পৌঁছায়। সে তার শিল্প কর্মের দিকে তাকায়। ছাঁচ নেই কিছু নেই, মাটি বেছে, তাকে গুঁড়িয়ে, ছেঁকে, ছেনে নিয়ে তবেই একটা আকার দেবার চেষ্টা। কতগুলো মুখ সে তৈরী করেছে মাত্র, রঙ নয়, কিছু নয়, শুধু মুখ। টিকোলো নাকের দুই পাশে দুটি বিন্দু, দুটি ভ্রূধনুর নীচে পটল-চেরা দেবী চক্ষু! পদ্ম-পাপ্‌ড়ির মতো পাতলা ঠোঁটে মৃদুহাসি, এক ঢাল চুলে মস্ত খোঁপা।

এই দেখেই বর্জু বললে,—সুন্দর হইছে, গুপীবল্লভপুরের মেলায় খুব বিকাবে। শিখাই দাও আমারে শিল্পকম্ম।

ঘরের একদিকে তার শিল্পকর্ম আর চাটাই-পাতা কাঁথা-বালিশ,

অন্যদিকে হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদি। রান্নার সময় এই হাঁড়ি কুঁড়িই বাইরের দাওয়ার কোণে চলে যায়, সেখানে উনুন খোঁড়া আছে। আবার দাওয়ারই অন্যদিকে তার কাজের জায়গা। ওখানে বসেই সে মাটি তৈরী করে, মাটির গোলায় বসে-বসে চোখ আঁকে, অধর-প্রান্তে হাসি ফোটায়। আবার কাজ হয়ে গেলে, সেই হাসি-মুখগুলিই ঘরের ভিতরে উঠে আসে। বর্জু বলে,—মঞ্জরী শিল্পকম্ম দেখতে চায়। আমি বলি, তুমি নিজে গিয়ে দেখে আসতে পার না? তা মুখ টিপে-টিপে হাসে, বলে,--তোমার সাঙাতের আর শিল্পকম্ম হবেক্ নাই।

—অবাক হয়ে মানিক জিজ্ঞাসা করে—কেনে?

হো-হো করে হাসে বর্জু, বলে,—মঞ্জরী রসিকা আছে হে। বলে,—সাঙাত মুখ গড়বে, না, আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকাই থাববে?

বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে যায় মানিকের, সে শুষ্ক কণ্ঠে বলে,—ই কথা কেনে। বর্জু বলে,—ইটা কি আমি বুলতে পারব? ই হচ্ছে গিয়ে তুমাদের কথা। আমি গেরামের জামাই হইছি ক বছর? তার আগের কথা তুম্‌রাই জানো।

মানিক ভয় পেয়ে ওর হাতটা আঁক্‌ড়ে ধরে, বলে,—তেখন ছোট ছিলম আমরা, দোষ ধইরো নাই।

এবারে, আবার হো-হো করে হেসে ওঠে বর্জু, বলে,—ই দেখ, খুঁড়তে বললাম কেঁচো, তুমি খুঁড়লে সাপ। বলি, তামাসাটাও বুঝতে নারলে? কী রকম শিল্পী বট তুমি হে?

ছৌ নাচের দলে গিয়ে 'শিল্পী' শব্দটা ভালো করেই শিখে এসেছে বর্জু, এটা সে যখন সুযোগ পায়, তখনই ব্যবহার করে, বলে,—তুমি শিল্পী, আমিও শিল্পী, আমাদিগের সাঙাতি কখনও টুট্‌বে না, কী বল?

এসব কথাই হয়েছে এ-কদিনের মধ্যে, ঘর বাঁধতে বাঁধতে, অথবা কাজের ফাঁকে ফাঁকে, কখনো বা রান্নার অবকাশে। আজ ঝড়ের

মুখে থমকে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বাঁশীর সুরের মতো কানের কাছে বেজে চলেছে ক্রমাগত। মঞ্জরী তার বহু দূরের মানুষ, যে চারদিন ওদের ঘরে সে ছিল,—মঞ্জরী ঠিক তেমনি দূরেই ছিল, তেমনি কপালের ওপরে ঘোম্‌টা ওঠানো, তেমনি কৌতুকে ঝলমল করা দুটি চোখের গোপন চাউনী। কালো চোখের তারা দুটি আর কিছুই বলতে চায় না, শুধু হাসির আভায় ঝিলমিল করে ওঠে।

দেখতে দেখতে দূর দিগন্তে বাতাসের মোড় ঘুরল, বৃষ্টি তত নয়, যত ঝড়। শ্রাবণ মাসে দুরন্ত কালবৈশাখীর মতো বিশালকায় কালো ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে করতে বিপুল ঝঞ্ঝা এসে টিকাইতপুরের গরীব চাষীদের নড়বড়ে ঘরগুলোর খুঁটি ধরে প্রবল নাড়া দিয়ে চলে গেল। বর্জুর সাবধানতার অন্ত নেই, হাঁক-ডাকে সে বাড়িটা অস্থির করে তুলল, ও বউ, ইখানে বালতি বসা, জল চুঁইয়ে পড়ছে। ও বউ, হাই দেখ, রান্নাঘরের চালখান্‌ বুঝি উড়্যে গেল!

দুজনে দিক্‌বিদিক শূন্য হয়ে উঠনে নেমে পড়লো, রান্নাঘরটাকে বাঁচাবার জন্য। দুরন্ত হাওয়ায় আঁচল উড়ে গেল, মঞ্জরী বুকের ওপর আঁচল আর না তুলে কোমরে বেড় দিয়ে নিলো। গায়ে তার জামা আছে, বৃষ্টির জলে ভিজে টই-টম্বুর হলেও বা ক্ষতি কী? চৌহদ্দীর মধ্যে তার স্বামী ছাড়া আর আছে কে?

রান্নাঘরের চাল ঠিক ওড়েনি, উড়তে উড়তে বেঁচে গেছে বলা যায়। ঝড়ের শেষে যখন শুধু টিপির-টিপির অল্প-স্বল্প বৃষ্টি পড়ছে আর হাওয়ার বেগ একটা স্থিরতা লাভ করেছে, তখন রান্নাঘরের চালের অবস্থা দেখে ব্রিজনারায়ণ কী এক অদ্ভুত কৌতুক অনুভব করে হেসে-হেসে খুন হলো একেবারে।

—ই দেখে, কী হইল তুমার?

বলতে বলতে ওর হাসির ছোঁয়ায় মঞ্জরীও হেসে ফেলে।

বর্জু বলে,—রান্নাঘরের চালটা দেখ? ইটা দেইখ্যা কিমন লাগ্‌ছে জান? রাত ভোরটি হইলে তুমি যেখন ঘুম থিক্যা উঠ,

তেখন তোমার মাথার আউল্যা চুলের যে অবস্থাটি হয়, ঠিক তেমনটি হইছে।

—অসভ্যটা!

বলে, মঞ্জরী লজ্জা পেয়ে মুখখানা ঘুরিয়ে নেয়। তারপরে, সে-ভাবটা একটু সামলে নিয়ে রাগ করে বলে,—আরও দাতাকন্ন হও! সাঙাত্‌রে খড় দিতে হবেক ত, ঘরের বাতা ধরে টান্ দাও। ইমন সাঙাতিও দেখি নাই বাপু। নিজের শোবার ঘরটিও যে যায় নাই, সিটা ভাগ্য বইলে মেনে লাও!

উঠে, শোবার ঘরের চালের দিকে ভালো করে নজর দেয় বজ্রু, তারপরে স্ত্রীর দিকে ফিরে বলে,—না, তুমার ডর করবার কিছু নাই। ই চালটায় কী অবস্থা হইছে জান? আমি ঘরকে না থাকলে তুমি তেখন রাত ভোরে উঠ, খোঁপায় টান পড়ে নাই, ঘুমের ঘোরে বালিশে মাথা ঘস্‌ছ, তাই সিঁথিটা মাত্তর আউলাইছে, আর কিছু না।

মুখখানা আবার রাঙা হয়ে ওঠে মঞ্জরীর, আবার সে 'যাও'—বলে ঝংকার দিয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনেও একটা পরিহাসের সুর ধ্বনিত হয়। অধরের কোনে একটা বাঁকা হাসি টেনে এনে সে বলে,—তুমি যেখন ঘরকে থাকো না, তেখন আমি বালিশে মাথা ঘসি, না, কী করি, তুমি জাইন্‌লে কিমন কইরে? বজ্রু অপ্রতিভ হবার মানুষ নয়, বলে,—জানতে পারি গ' আমার আপনোর মনটি দিয়ে। তুমি ঘরটিতে বইসে কখন কী কর আমি জানতে পারি নাই? সব জানতে পারি।

মঞ্জরী মৃদু কণ্ঠে বলে,—আমার উপর তুমার পুরাপুরি বিশ্বাস আছে?

বজ্রু এগিয়ে গিয়ে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে, বলে,—আছে গ, আছে। না থাকলে হাসছি কী কইরে, কথা বুল্‌ছি কী কইরে, আহ্লাদটা পাইছি কী কইরে?

শুনতে শুনতে কে জানে কেন, মঞ্জরীর চোখদুটি জলে ভরে ওঠে বলে,—ডর লাগে না তুমার ?

—কীসের ডর ?

—একা থাকি, যদি কেউ আইস্যা ডাকাতি কইরে নিয়া যায় ?

বর্জু বলে,—ইমন ডাকাত আছে কে হে ?

—থাকতেও ত পারে ?

বর্জুর মুখের হাসি নিভে যায়,—কে সে ?

ওর মুখের ভাব দেখে মঞ্জরী এবার হেসে ফেলে। চোখে জল মুখে হাসি, মঞ্জরী বলে,—কেউ নাই গ, আমার পরাণ তেবে দুখায়। তুমি থাকো না কেনে ঘর দুয়ারে, লাচের দলে ছুইট্যা যাবার দরকার কী ?

বর্জু বলে,—বুঝ না, কী দরকার ?

—কী দরকার ?

বর্জু বলে,—শিল্পী মানুষ বটি, মাঝে মাঝে মন-উচাটন হবেই। তুমার হয় না ? তুমারে ত লাচ শিখাইছি।

—এই চুপ—চুপ !—বলে স্বামীর বুকের ওপর মৃদু আঙুলের টোকা দেয় মঞ্জরী, বলে—কাক-কোকিলে যি কথা জানে না, সি কথাটা কি মুখে বলতে লাগে ? সুখীর মাও জানে নাই, উটা হইছে তুমার-আমার কথা।

বর্জু বলে,—কিন্তু, সত্য কথাটা বল ? লাচতে তুমার ভালো লাগে নাই ? আপনকার দেহটা দেখ, দেহের বাঁধুনীটা দেখ ? গেরামের কোন্ বউটার ইমন গড়ন গ ?

মঞ্জরীর চোখ দুটো সুখের আবেশে বুজে আসে। সে জড়িত কণ্ঠে বলে,—আপন বউয়ের রূপ সবাই সু-নজরে দেখে, ইয়াতে লতুন কথা কী হইল ? তেবে হঁ, লাচতে খুব ভালো লাগে।

বর্জু বলে,—একটা ত লাচ শিখেছ বটে। আমাদের দলটিতে বলে, "লাইসা লাচ্"। ইবার আরেকটা লাচ শিখাবো। তেবে,

আর ঘরের দরজা-জান্‌লা বন্ধ কইরে লয়, ইবারে উঠানের মধ্যে ঢোলটা নিয়া বসব, ইঁ ?

লজ্জায় নিজের মুখখানা এবারে চেপে ধরে স্বামীর বুকের ওপর, বলে,—সরম নাই মোর ?

—কাঁয় ?

—ধ্যেৎ, আমি পারব নাই। তুমার সামনে ভেন্ন আমি লাচবই বা কেনে ?

বর্জু বলে,—ই দেখ, আমি কি ভাবনটা কর‍্যাছি মনের ভিতর, তুমি তা বুঝবে কী কইরে ? ভাবন কর‍্যাছি, তুমারে লাচ শিখায়ে দলে নি যাবু, তেখন আর দূরে থাক্যা আমাকে মনটারে টিকাইতপুরে পাঠাতে হবেক নাই।

—দূরে থ্যাক্যা মনটারে পাঠাও বুঝি ?

—লয় ?

—ছাই। তেখন আর বউটারে মনেও পড়ে না।

—ই্যা, কি বুললে ? পরাণটারে কি চিরে দেখাবু ?

—থাক হইছে, পরাণ থাকলে ত চিরবে ?

বর্জু আবার ওর হাত টেনে ধরে, বলে,—ভিজা শাড়ী ভিজা জামা তুমার গায়ে লেপ্‌ট্যা গেছে। সব ছাইড়্যা ফেল না, একটুক্ দেখি ?

—আঁাই—আঁাই !—বলতে বলতে ছুটে পালায় ঘরের দিকে।

টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টির তখনো বিরাম নেই। ওরা কিন্তু সেই বৃষ্টির ধারাকে গ্রাহ্য না কোরেই উঠনে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছিল। কথা বলছিল আর ভিজছিল। রক্তে চাষী আর চাষীর বউ, বৃষ্টির জল ওদের কাছে আনন্দের ধারা, ভিজতে আর দ্বিধা কী ?

বর্জু তখনো উঠনে দাঁড়িয়ে। মঞ্জরী রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলেও কাপড়-চোপড় ছাড়্‌লো না, সেই ভাবেই শুকনো ঘরের মেঝে আর দাওয়ার ওপরে ভিজে পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে

উঠনে আবার নেমে এলো, বললে,—নটুয়ামশায়, ঘর ত আগলাইলেন, ইবার মাঠের কথাটা ভাবন করতে হয়। রোয়া ধানগুলা ঝড়ে উপ্‌ড়েই দিলে কিনা, কে জানে?

যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে আসে বর্জু, বলে,—সত্য কথা ত বটে! চলো—চলো—ঘরতুয়ার যা আছে পইড়ে থাক।

—কথাটা ভালো লয়। শিকলতুটা তুইল্যা দাও।

তুটি ঘরে তুটি শিকল তুলে দিয়ে ভিজে জামা-কাপড়েই ওরা মাঠের দিকে ছুঠ্‌তে থাকে। সেই পায়ে-চলা পথ, সেই হরতকীগাছের তলা। বর্জুরই বুঝি খেয়াল হয় প্রথম, বলে,—সাঙাতের খবরটা কী? আইসো, দেইখে আসি।

মঞ্জরী বলে,—তুমি দেখ গিয়ে, আমি মাঠে চল্‌লম। আমার আপন হাতের রুয়া ধান, বুইঝ্‌লে?

কিন্তু বর্জু ওকে যেতে দিল না, একখানা হাত চেপে ধরলো শক্ত করে। মঞ্জরী চারদিক দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল—আঃ ছাড়ো—দেইখ্যে ফেলবে কে?

—ফেলুক! আমরা স্ত্রী-পুরুষ ত বটেক্‌।

—তা হউক। বুক-খালি মনিষগুলোর চোখ টাটায়—জান না?

বর্জু ওর হাত ছেড়ে দেয়। মঞ্জরী আর ওর অবাধ্য হয় না।

ক্ষেতে না গিয়ে ওর পিছনে-পিছনে মানিকের ঘরে এসে দাঁড়ায়।

ঘরের চালের খড় অর্ধেক উড়ে গেছে, উঠনময় ভিজে খড়ের ছড়াছড়ি। আর ঘরের মধ্যে মানিক বসে আছে চুপচাপ।

সারা ঘরটা জলে ভিজে, তার নিজের কাপড়চোপড় পর্যন্ত ভিজে, এমনকি, বর্জুদের দেওয়া কাঁথা-বালিশ পর্যন্ত ভিজে ঢোল। মানিকের সেদিকে মন নেই, সে তার জলে গলে যাওয়া পুতুল-গুলোর দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। কোনোটা একেবারে মিশিয়ে গেছে মাটির সঙ্গে, কোনটা অর্ধেক গলে গেছে,

কোনটার নাক-চোখ-ঠোঁট নেই, কোনটার আর কিছু নেই, শুধু নাক আর নাকের ডগার দুটি 'পাথর' অক্ষুণ্ণ আছে।

দেখে শুনে বর্জু অবাক, বললে,—আমাদের ঘরের দিকে ছুট্ দিতে পার নাই? অমন পরিচ্ছন্নমের কাম সব যে মিছা হই গেল হে!

মঞ্জরী মৃদু গলায় বললে,—বিছানাটার অবস্থা দেখ।

—বিছানা যাই হউক, পুতুলের মুখগুলা গেল ত?

মঞ্জরী মুখ ফেরালো মানিকের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জায় একটু সংকুচিত হয়ে উঠলো। কাপড়-চোপড় ভালো করে টেনেটুনে দিতে দিতে বেরিয়ে গেল বাইরের দাওয়ায়। মানিকের দুটি চোখ যেন কীরকম-কীরকম! লোভীর মতো চাউনীও নয়, অথচ মুগ্ধদৃষ্টি। যেন দেব-প্রতিমার সামনে দুটি প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করছে সে!

ঘর থেকে ততক্ষণে ভেসে আসছে বর্জুর কণ্ঠস্বর, বলছে,—যা হবার হইছে বিষ্টি থামলে পর চালের ব্যবস্থা করা যাবে। ইখন উঠ দেখি? আমাদের সঙ্গেরে মাঠে আইস। আমি তুমার ঘর তুলার কাম কইরা দিছি, তুমি আমার ধান তুলার কাম করবে আইস।

এ কথা বললে যেতেই হয়। খালি গা—ধুতিটা ভিজে। বর্জুরও তাই। ওরা দুজন, আর মঞ্জরী।

মাঠের ওপর দিয়ে তখন ঢেউ বয়ে চলেছে। ওদের ক্ষেতে এসে দাঁড়াতেই বর্জুর বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। বীজতলা থেকে ধানের গাছ তুলে এনে সার-সার দিয়ে ধান রুয়ে দিতে হয়। সেই রুয়া ধানের গুছি যেন টান দিয়ে উপড়ে দিয়েছে কোনো দুষ্টু লোক। জল নিকাশ করে ধানগুলো আবার রুয়ে না দিতে পারলে সর্বনাশ কাণ্ড হবে। মানিক বললে,—তোমাদের নিজের জমি?

বর্জু বললে,—না হে, জমি আমাদের নয়। আমরা ভাগচাষী। এই একখণ্ড ভুঁই ভাগে চাষ করি। মানিক অবাক হয়ে দেখতে লাগলো,—পরের জমি হলেও ওদের মমতা অপরিসীম। মঞ্জরী

যেন মুহূর্তে বাইরের সব কিছু ভুলে গেছে। ভিজে শাড়ীর প্রান্ত পায়ের কাছে হাঁটু পর্যন্ত তুলে পুরুষদের মতো মালকোঁচার ভঙ্গীতে পরে ফেললো, আঁচলটা বুকের ওপর দিয়ে গুছিয়ে নিয়ে এসে কোমরে বেশ করে বেড় দিয়ে নিলো। মাথার চুল খোঁপার শাসন-মুক্ত হয়ে পিঠের ওপর এলিয়ে পড়ে লেপ্‌টে গেছে। মঞ্জরী দুই পা রেখে যতদূর সম্ভব হেঁট হয়ে ধানের গুছিগুলি রুয়ে দেবার চেষ্টা করছে আর ওকে টেনে নিয়ে বর্জু পা দিয়ে জল সরিয়ে জমির নাবাল দিকটায় নিয়ে যাবার প্রয়াস করতে লাগলো। আলের একদিকের মাটি সরিয়ে আল্‌গা করে দিলো বর্জু, জল সেই ছিদ্র-পথে নীচের জমির ওপর হুড়হুড় করে এসে পড়তে লাগলো।

দেখতে দেখতে অন্য সব জমির মানুষগুলোও এসে পড়লো। স্ত্রী-পুরুষ সবাই, এমনকি এগারো-বারো বছরের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত। কারুর আর অন্য কোনোদিকে লক্ষ্য নেই, যে-যার নিজের জমিন নিয়ে ব্যস্ত। সবার মাথাতেই টোকা, শুধু এদের তিনজন ছাড়া। এরা তিনজন দলছুট ভিন্নগোত্রের যেন। জল নিকাশের কাজটা সোজা নয়, আবার তোড়ে সমস্ত আলটাই না ভেঙে দেয়, সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর—কাজটা যখন অনেকটা সহজ হয়ে এলো—তখন বর্জু একটু-আধটু কথা শুরু করলো। বললে,—বুঝলে হে সাঙাত, এ-দিগরের জল কিমন জানো? ক্ষেতটির উপর পইড়ে আছে ঠিক শান্ত আর ভালো মানুষটির মতো, কিন্তু আস্‌লো যদি ঝড় বৃষ্টি, ত, তেখন আর বাঁধন মানবেক নাই—লষ্ট মেইয়ামুষের থিক্যাও বড় হবেক তার! দেখছো না? খরা লদীর মতো কিমন তোড় নিয়ে ছুট্যাছে?

মঞ্জরী কিন্তু এ-সব কথায় মন দেয় না, সে ধানের গুছি নিয়ে সারি দিয়ে রোয়া করতে ব্যস্ত। ক্ষণে ক্ষণেই অবাধ্য চোখ দুটো চলে যায় তার দিকে। গায়ের ভিজে জামাটা ভেদ করে উচ্ছল

যৌবনের দুটি প্রস্ফুট পদ্ম যেন তার দল মেলে দিয়েছে। শীর্ষবিন্দু দুটি সর্ব আবরণ ভেদ করেও তার সুমধুর অস্তিত্ব ঘোষণা করতে চায়।

কিন্তু সব কিছুরই সমাপ্তি আছে। টিপির-টিপির বৃষ্টিও শেষ হয়, ওদের কাজও সমাপ্ত হয়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কতো বেলা হলো বুঝবার উপায় নেই, মেঘের ঘোম্‌টা পরে আকাশটা যেন চুপচাপ বসে আছে। গ্রামের ছেলেপিলেরা বেরিয়ে পড়ে ছুটোপাটি করছে। চারিদিকে ঝর্ণার মতো জলের ধারা, উপ্‌চে এসে নালার ওপর পড়ছে। নিরীহ নালাটা এখন খরস্রোতা নদী, পার হবে সাধ্য কার?

যাদের কাজ শেষ হয়েছে, তারা ঘুর পথে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

বর্জু নালাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে,—লষ্ট মেইয়ামানুষের মতো চোখ মারে হে?

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায় মানিক। বর্জু বলে,—জলের খাই দেখ না? চলতে-চলতে ঘুর-ঘুর কইরে ঘূর্ণী তুলছে। দেইখে কী মনে লয়? মেইয়ামানুষের চোখ-মারা লয়? উ দেইখে ঝাঁপাই পড়ো, একেবারে টান দিয়ে তলিয়ে লিয়ে যাবে হে, আর উঠ্‌তে লারবে।

মঞ্জরী আর থাকতে না পেরে ঝাম্‌টা দিয়ে ওঠে, যদিও মৃদু কণ্ঠে,—হইছে কী। লাজ নাই?

বর্জু হেসে ওঠে,—ই দেখ, লদী আর নারী একই বটে। সুবিধা পাইলেই ঝাম্‌টা মারে। দেখ না? ছোট্ট নালা, আজ খরা লদী হইয়ে ঝামটা মারছে, পার হবে কার সাধ্যি হে? চল সাঙাত, ঘুইর‍্যাই যাই।

ঘুরে ঘুরেই ওরা চলতে লাগলো। প্রায় আধ ক্রোশখানিক পিছিয়ে আসবার পর সরকারী পুল পাওয়া গেল, সেটি পার হলেই সড়ক, তারপরে সড়ক ধরে পোয়াটাক পথ হাঁটলেই গ্রামে ঢোকা গেল। এই ঘুর পথে গ্রামে প্রবেশ করলে, ডানদিকে একটা ঢিবি

পড়ে। বেশ বড়ো একটা ঢিবি। তার ওপরে নানান্ গাছগাছালি ভীড় করে আছে, সবার ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শালগাছ। অনেক সময় দুঃসাহসী কিশোরের দল ঐ শাল-গুঁড়ি থেকে ধুনো সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। শালগাছের আঠাই হচ্ছে ধুনো। শালগাছে উই লাগে, উই খেয়ে-খেয়ে এমন অবস্থা করে নীচের দিককার গুঁড়ির যে তখন আর ধুনো পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। উই যখন প্রথম ধরে, তখন আঠা পেতে অসুবিধা হয় না। উইয়ের দাঁতের কামড়ে ব্যথা পেয়ে নির্বাক শাল থেকে যে অশ্রু নির্গত হয়,—তাই ধুনো হয়ে ঘরে এসে জ্বলে, আর সুগন্ধ বিকীরণ করে।

সমস্ত জায়গাটা একটা পরিত্যক্ত-অবহেলিত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে গোলাপী বিন্দুর মতো ছোট-ছোট ফুল নিয়ে লতার ঝোপ ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। একদিকে কয়েকটা শিশলগাছ উঠেছে, অনেকটা আমাদের আনারসগাছের মতো দেখতে, রঙটা সবুজ নয়, একটু সাদা-সাদা অথবা ছাই-ছাই রঙের। অন্যদিকে সার দিয়ে বেড়ে উঠেছে কয়েকটা ফণী-মনসা।

ঝড় এসে এখানেও মাতামাতি করে গেছে। ঢিবির চূড়ার শালগাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে পড়েছে। দুটি শিশল মাথা কাত্ করেছে, আর গোলাপী বিন্দুর মতো ফুল-ফোটা লতার কুঞ্জগুলি একেবারে উলটে একধারে পড়ে আছে। শুধু কিছু হয়নি ঐ ফণী-মনসাদের।

তিনজনেই মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে পায়ে-চলা পথটার ওপরে। যায়গাটায় অজস্র ঢিপি ছোট-বড়ো মিলিয়ে, কিন্তু গ্রামের লোক একে কথায় বলে,—কপাল ভাঙার মাঠ। অথচ মাঠ বলতে যে সমতলভূমির চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, এ তা নয়। ঝোপ, লতাপাতা আর গাছগাছালি কী এক অদৃশ্য সম্পদ যেন লুকিয়ে রেখেছে এখানে। গ্রামের লোক ভয়ে এদিকে বড়ো একটা

আসে না, এক দুঃসাহসী শালের আঠা সন্ধানী কিশোর দু একজন ছাড়া। গ্রামের লোকে শাঙন মাসের শেষে দুধ-কলা-ফুল-চন্দন এই সব নিয়ে আসে বিশেষ এক তিথিতে। সব বনের ধারে রেখে মনে-মনে মানত জানিয়ে আবার চলে যায়। চলে যাবার পর কী হয় কেউ দেখে না, দেখার জন্য কৌতূহল বোধ করে না।

কিন্তু, পরদিন অভিভাবকের শাসন-জাল-ছিন্ন করা দু' চারটি কিশোর এসে দেখে,—পূজার ফুল কিছু-কিছু শুকনো হয়ে পড়ে আছে বটে, দুধ-কলার চিহ্ন নেই, শুধু মাটির ভাঁড়গুলো পড়ে আছে, কোনোটা কাত্ করা, কোনোটা ভাঙা, কোনোটা সঠিক বসানো আছে।

গ্রামের লোক ছেলেদের সাবধান করে দেয়,—ওদিগের যেওনা বাপু, উ হচ্ছে মা-মনসার থান। জাগ্রত দেবী বটেন, উয়ারে চটাইয়ো না, ধনে-বংশে নির্মূল হইয়ে যাবে।

মা-মনসার থান হওয়া সত্ত্বেও কপাল ভাঙার মাঠ কেন যে নাম হলো,—এ জিজ্ঞাসা এদের কারুর মধ্যে জাগে না। কার কপাল যে এই মাঠে একদিন ভেঙেছিল, সে-খবরও জানতে চায় না কেউ।

মানিকেরও কৌতূহল নেই, কিন্তু ওদিকে তাকাতে গিয়ে এমন একটা বস্তু হঠাৎ তার চোখে পড়লো যে, বিস্ময়ের বিহ্বলতায় সে আর সরে যেতে পারলো না। একটা ছোট ঢিবি ঝড়ের প্রহারে মস্তকবিহীন হয়ে পড়েছে, আর তার ফলেই দেখা গেল, কালো একটা পাথরের পিঠ বৃষ্টিতে সিক্ত হয়ে ঝলমল করছে। ভিতরে-ভিতরে একটু চমকেই উঠলো মানিক, তার মনে হলো,—এ-ধরনের কালো পাথর এ-অঞ্চলে ত বড় একটা দেখা যায় না। এখানে এ-রকম পাথর এলো কোথা থেকে?

বর্জু ততক্ষণে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে, বললে,—কী হে সাঙাত, দাঁড়ালে কেনে?

মঞ্জরী ছিল সবার আগে। সে, বর্জু আর মানিক,—এইভাবে

আগে-পিছে করে তারা হেঁটে আসছিল। মঞ্জরী এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিক্ করে একটু হাসলো, বললে,—ভাবন লাগছে।

মানিক বললে,—উ-টা কী হে? পাথর লয়?

বস্তুটা এবার বজু'ও দেখলো ভালো করে, বললে,—তা' হবেক।

—এখানে উ পাথর আইল কিমনে, হঁ?

বজু' বললে,—ক্ষিদায় পেট চোঁয়ায়, উনি ইখন পাথর নিয়ে পড়লেন। ইটা কপাল ভাঙার মাঠ বটেক, তার মা-মনসার থান, ইখানে সবই হতে পারে। অবাক হলে চলবে কাঁয়? আস, পা চালাই আস।

মঞ্জরী তেমনি মৃদু কণ্ঠে বললে,—একেবারে আমাদিগের ঘরকে আসতে বল।

বজু' বললে,—হঁ—কথাটা ঠিক। চল হে সাঙাত, বউ দুটা ফুটাই দিবেক, তিনজনে খেয়ে লই। তারপর দেখা যাবে তুমার ঘরটার কী করা যায়।

মানিক মৃদু আপত্তি করলেও তা টেঁকে না।

যেতে-যেতে এমন একটা যায়গায় ওরা এলো, যেখান থেকে ডাইনে বেঁকলে মানিকের ঘরে আর বাঁয়ে বেঁকলে সংক্ষিপ্ত একটা পথে বজু'র ঘরে পৌঁছনো যায়। মঞ্জরী পিছনে না তাকিয়ে অধিনায়িকার মতোই বাঁদিকের পথ ধরে। সে জানে, বাকী দুজন তাকে অনুসরণ করে আসবেই।

মাঝে পড়ে কুঞ্জ প্রধানের আটচালাখান। উঠনের জঞ্জাল পরিষ্কার করাচ্ছিল প্রধান-খুড়ি তার ছেলেমেয়েদের দিয়ে, মাহিন্দারদের দিয়ে। তার গোয়াল থেকে একটা বাছুরের হাম্বারব শোনা যাচ্ছিল। ওদের যাওয়াটা তা বলে খুড়ীর চোখ এড়ায়নি। সে মঞ্জরীর উদ্দেশে বললে,—মাঠ সামলে আইস্লি, ও পটু?

হঁ—বলে আরও জোরে পা চালিয়ে দেয় মঞ্জরী। একটু এগিয়েই একটা বুড়ো আমগাছ, তার তলায় এসে মঞ্জরী হঠাৎ থমকে

দাঁড়ায়, তারপরে ওদের দিকে পিছন ফিরে শাড়ীর মালকোচা অবস্থাটা খুলে স্বাভাবিক করে নেয়।

মঞ্জরীর পা-দুখানা নিটোল আর মসৃণ কদলীকাণ্ডের মতো। হাঁটুর নীচে পায়ের পিছন দিককার মাংসপেশীতে দুটি উল্কি আঁকা,—শতদল পদ্মের আল্‌পনা-রূপ,—অর্থাৎ হুবহু পদ্মফুলের ছবি নয়, শিল্পীর দৃষ্টিতে পদ্মফুল,—কয়েকটি বক্র ও সরলরেখার সমষ্টি,—পদ্মের প্রতীক বলা যেতে পারে।

কিন্তু পাড়ায় ঢুকে মঞ্জরীর বুঝি হঠাৎ হুঁস হলো, তাই তার পায়ের পদ্মকে সে তাড়াতাড়ি ঢেকে দিলো শাড়ীর ঘেরাটোপে। ততক্ষণে ওরা দুজন এগিয়ে গেছে।

—ইটা আবার কী হইল ? বেশ ত ছিলে ?—বর্জু প্রশ্ন করলো থম্‌কে দাঁড়িয়ে। মানিক ওকে ছাড়িয়ে কিছুটা আরও এগিয়ে গেল।

মঞ্জরী রাগ করে বলে,—যা হইল তা হইল, তুমার কী ?

তারপরেই মুখ ঘুরিয়ে স্বামীকে বলে,—উনান ধরাও গিয়ে দুইজনে। আমি পারব নাই। আমার অনেক কাম।

ততক্ষণে ওদের বাড়ির 'পাছ-দুয়ারে' ওরা এসে গেছে, আগড় ঠেলে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বর্জু বলে,—আইস হে সাঙাত। এত পারি, আর উনান ধরাতে পারব নাই ?

মঞ্জরী এবারে ওদের পিছনে। বলে উঠলো,—শুধু উনান কেনে, হাঁড়ি বসায়ে দুটি চালে-ডালে একেবারে ফুটায় লাও। মেঘলা দিনে খিচ্‌ড়ি তুমাদের ভালাই লাগবে।

—সিটা ঠিক কথা—বর্জু বলে,—কিন্তু রান্নাটাও আমরা করবু।

—করবুই ত।—মঞ্জরী বলে,—আমার অনেক কাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের গৃহস্থালী শুরু হয়ে যায়। রান্নাঘরের দাওয়ার কাছাকাছি গিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুতে কাপড়ের কোঁচা নিংড়ে জল বার করে, সেই কাপড়ে গা-হাত মোছে। আর মঞ্জরী চলে যায় তার ঘরের ভিতরে।

মানিকের ভাব দেখে মনে হয়, সে যেন কী রকম স্থানুবৎ হয়ে

গেছে। অর্ধেক মন তার এ-বাড়িতে আর অর্ধেক মন তার রয়ে গেছে সেই মা-মনসার থানে, কালো পাথরের কাছে। স্পষ্ট কিছু যে ভাবছে তা নয়, অথচ ভাবনাটাকে সেখান থেকে সরিয়েও আনতে পারছে না।

বর্জু বললে,—তুমি ত সাঙাত, আমাকে আজ অবাকৃটি কইরে দিছ হে! বেশ ত করলে ক্ষেতের কাজ, ধান রুইলে উস্তাদ্‌টির মতো। তেবে আর ভাবনটি কী? পয়সার টান পড়লে ক্ষেতির মজুরীও করতে পারবে।

মানিক মাথা নীচু করে নীরবেই একটু হাসে, কিছু বলে না। ওদিকে ঘরের দরজাটা খুলে যায়, শুক্‌নো হল্‌দে একটা শাড়ী প'রে বেরিয়ে আসে মঞ্জরী। মাথায় ঘোম্‌টা নেই, গায়ে জামা নেই, মাথার ভিজে চুলগুলি পিঠের ওপর ফেলা, শাড়ীর আঁচলটা বুকের ওপরে যত্ন করে ঢাকা দেওয়া। মঞ্জরীর হাতে ছিল একখানা আধময়লা শুকনো ধুতি, আর নীল রঙের একখানা শুকনো শাড়ী। শাড়ীখানা স্বামীর হাতে দিয়ে বললে,—পরো। ধুতিখানা এগিয়ে দেয় মানিকের হাতে নিশ্চুপে।

বর্জু বলে,—রঙীন শাড়ী পরালে আমারে, আর বন্ধুরে সাদা ধুতি? বেশ।

মঞ্জরী দুষ্টুমী করে বললে,—তুমার জেবনে রঙ আছে, উয়ার জেবনে কই? উয়ার সাদাই ভালো। নেন গা?

বর্জু বললে,—নাও গ সাঙাত, তুমারে বুল্‌ছে।

মানিক হাত বাড়িয়ে কাপড়খানা নিতেই মঞ্জরী মুখ ফেরায় স্বামীর দিকে, বলে,—মন স্থির কইরে রান্নাবান্না-কইরো, আমি যাই পরধান-খুড়ীর কাছে।

—কাঁয়?

—দরকার আছে। তুমি বুঝবে না।

বলে, আর দাঁড়ায় না, হুমদাম পা 'ফেলে উঠন পার হয়ে ভিতর-দিক্‌কার আগড় ঠেলে বেরিয়ে যায় মঞ্জরী। বর্জু কাপড়

বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে বলে,—হইল বেশ। কত্তা রইলেন উনানে, গিন্নী গেলেন পরদেশ।

মানিক বলে,—পাশের ঘর আবার পরদেশ হইল কবে হে?

বজুর্ বলে,—বিহা ত কর নাই, বুঝবে কিমন কইরে? চক্ষুর নাগালের বাইরে যাওয়াই হইল পরদেশ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা শুক্‌নো কাপড় পরে রান্নার কাজে লেগে গেল। উনুন ধরালো, হাঁড়িতে জল দিয়ে চাল-ডাল-কাঁচকলা আর পেঁপে একসঙ্গে ছেড়ে দিল। বজুর্ বলে,—মঞ্জরী পরধান খুড়ার বাড়ী গেল কেনে, ই আমার মাথায় আস্‌ছে না।

মানিক প্রশ্ন করে,—কোন্ পরধান হে?

—কেনে? কুঞ্জ পরধান। আসবার সময় খুড়ী হাঁক পাড়লে, শুনলে না?

—হ্যাঁ। তা শুন্যেছি।

—তেবে?

মানিক কোনো উত্তর দেয় না। একটু পরে, কিছুটা দ্বিধার শেষ সে বলে ওঠে,—বজুর্ ভাই?

—কী?

মানিক বলে,—বজুর্ ভাই, তোমার দেওয়া কাঁথা-বালিশ ভিজা ঢোল। ঘর গিয়া রোদ্দুরে দিয়া আসি, কী বল?

বজুর্ বলে,—শুধু কাঁথা-বালিশের কথাই ভাবলে হে? তুমার ঘরখানার চেহারা হইছে যেন অক্রুর খবরের পর রাধিকার মতো। আউলাইন্যা বেশ-বাস, আর রিদয়খান উপ্‌ড়াইন্যা ফেলানো। ই কি সামলানো একা তুমার কাম? পেটের আগ নিভায়ে লাও, তারপরে দুজনে মিলে সব গিয়ে গুছাই দি' আসি।

মানিক বলে,—ভালো কথা। তেবে এক পলকের তরে ঘরটার হাল দেখে আসি না কেনে?

কিন্তু 'এক পলকের তরে' একা একা কী দেখতে এলো, মানিক? তার উঠনে একটিও খড় ইতস্তত পড়ে নেই, সব খড় আর কুটো এক যায়গায় স্তূপ করা; আর দাওয়ার আড়ায় ঝুলছে কাঁথাখানা, বালিশটা তারই নীচে চাটাইয়ের ওপর। মেঝের ফাঁক দিয়ে একফালি রোদ্দুর এসে তার ওপর পড়েছে—কার যেন স্নেহ-করস্পর্শের মতো।

কী-এক সন্দেহ তার বুকের মধ্যে হঠাৎ তোলপাড় শুরু করে দিল। লঘু পায়ে সে উঠে এলো ঘরের ভিতরে। তার সেই জলে-গলে-যাওয়া আর অসামাপ্ত পুতুল-মুখগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে পটু, বর্জুর মঞ্জরী।

মানিকের আসা সে টের পায়নি; এখন যদি পায়, তাহলে হয়ত চম্‌কে চেঁচিয়ে উঠবে। তার থেকে তার নিজেই ধীরে ধীরে সরে যাওয়া ভালো। কিন্তু ঝাঁপের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেও চোখ তার ঘরের পরিধি ছাড়তে চায় না। হলদে শাড়ীটা সে আবার পরেছে মালকোঁচার ভঙ্গীতে। পায়ের পিছন দিককার সেই রেখায়িত ক্ষুদ্রকায় পদ্মদুটি আবার বুঝি ফুটে উঠেছে। গায়ে জামা নেই, পিঠ ভর্তি ভিজে চুল, যে-টুকু দেহের অংশ দেখা যায়, তা যেন কাঁচা হলুদের বর্ণ!

ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে মঞ্জরী। চমক সে পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্য করলো না। হাতে একটা সমার্জনী ছিল, সেটা মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে মৃদুকণ্ঠেই প্রশ্ন করলো, —সে কোথায়?

গলাটা যেন হঠাৎ শুকিয়ে উঠেছে, কোনক্রমে উত্তর দিলো মানিক্য,—বাড়িতে।

—তুমি আসলে যে?

—ঘর-দুয়ার দেখতে।

—দেখ, আমি যাই।

বলেই ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে দাওয়ায় নেমে সে দ্রুতপায়ে চলেই যাচ্ছিল। পিছন থেকে মানিক ডাকলো,—শুনো?

থম্‌কে দাঁড়ালো মঞ্জরী।

মানিক বললে,—আসলে কেনে?

—দেখছই ত, কেনে আস্‌লাম।

মানিক বললে,—পরধান খুড়ীর বাড়ি যাবে বুললে যে?

অল্প একটু হাসলো মঞ্জরী, বললো,—হাঁ, গিছিই ত। ঝাঁটাটা দেখছ না? ইটা আন্‌লম।

—বজুঁরে বুললেই পারতে?

—কাঁয়? দোষ হয়েছে?

—বজুঁ যদি আইস্যে পড়ে?

—পড়িলে কি দোষ ধইরবে?

—যদি ধরে?

—কাঁয়?

মানিক চুপ করে যায়। কী বলা উচিত, কী ভাবে বলা উচিত, সেটা হঠাৎই তার মাথায় আসে না।

মঞ্জরী কিন্তু নড়ে না, একভাবে দাওয়ার একখানা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরে, বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর কথা বলে। বলে,—পুতুল-গড়ার সথ হইল বুঝি?

—সখ লয়। পেট চালাইবার দরকার।

—পেট চালাইবার তরে আর কিছু ছিল নাই?

—আর কিছু শিখি নাই।

—কেনে—পট? আমার বাবার কাছে থিক্যা শিকতে না—ছোটবেলায়?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মানিক বলে,—হইল কই শিখা?

—ইখন পুতুল ধর্যাছ?

—হুঁ।

—বিকাবে?

—মনে ত লয়।

—কী পুতুল ?   দেব-দেবী ?

মানিক বলে,—মুখ দেইখ্যে কী মনে লয় ?

মঞ্জরী বলে,—চেনা যায় না।

—চিনবেক্—পরে।

ঠিক এই সময় হরীতকীতলায় একটা পদশব্দ বেজে ওঠে। আর পরক্ষণেই শোনা যায় বর্জুর কণ্ঠস্বর,—সাঙাত্ হে ? খিচড়ি হই গেল, ত্বরিত আইস।

সারা দেহটা যেন কেঁপে ওঠে মানিকের, ভয়ার্ত কণ্ঠে সে বলে ওঠে,—ভিতরে যাও, তুমার স্বামী।

মঞ্জরী নির্বিকার। বলে,—কাঁয়   ভিতরে যাব কেনে ?

বর্জু উত্তর না পেয়ে সটান উঠনে চলে আসে। ওদের দুজনকে দাওয়ায় দেখে একটু যেন থম্‌কে দাঁড়ায়, তারপরে পায়ে পায়ে ওদের কাছে সরে আসে। অবাক হয়ে বলে,—বউ, তুমি ইখানে !

হাতের ঝাঁটাটা ধপ্ করে ফেলে দিয়ে একবার মানিকের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বড়ো-বড়ো পা ফেলে উঠন পার হয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে যায় মঞ্জরী, বর্জুর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে।

বর্জুর বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করে। সমস্ত মিলিয়ে কিছুই যেন তার কাছে বোধগম্য হতে চায় না। ব্যাপারটা বিশেষ করে মঞ্জরীর এই আচরণটা এতো দুর্বোধ্য যে মানিকও হঠাৎ কিছু বলতে পারে না।

অবশেষে মৌনতা ভঙ্গ করে মানিকই প্রথম। ভয়ার্ত আবেগে সে বলে ওঠে,—তুমি দোষ ধইরো না সাঙাত। আমার ঘর-দুয়ার সাফ করতে এস্যেছিল, আমি জানতাম নাই।

বর্জু ওর মুখের দিকে তাকায়, বলে—ঝাঁটা-টা কার ?

মানিক বলে,—পরধান খুড়ীর।

ঝাঁটা-টা তুলে নেয় বর্জু, তারপরে বলে,—দাঁড়াও আসি।

বর্জু ঝাঁটা-টা নিয়ে খুড়াকে দিয়ে আসে প্রথমে।

খুড়ী বলে,—উঠান সাফ হইল বাবা?

—হইল।

আর কথা না বাড়িয়ে হন্ হন্ করে চলে আসে নিজের বাড়ি। রান্নাঘরে মঞ্জরী টুকিটাকি কাজ করছে স্বাভাবিক ভাবেই। বর্জু বলে,—ঝাঁটাটা দিয়ে আসলাম খুড়ীকে।

মঞ্জরী সাড়া দেয় না।

বর্জু বলে,—উয়ার ঘর সাফ করতে কষ্ট কর্যে তুমি গেলে কাঁয়?

এবার যেন ফোঁস করে ওঠে মঞ্জরী। বলে,—নাঃ—আমি যাবু না। তুমার কাণ্ড জানা আছে। ঘর-দোর যিমনটি থাকবার তেম্‌নি থাকতো, আর সাঙাতরে শুইতে বলতে আপনকার ঘরে। তেখন? তেখন আমি কী কইরতাম? সারাটা রাত ছটফটাইয়া একা-একা বিছানায় কাটাইতাম, লয়?

বলতে-বলতে ওর চোখের কোনে ফুটে ওঠে অশ্রুর বিন্দু, গলাটা ধরে আসে। আর বর্জু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হো-হো করে হেসে ওঠে এতক্ষণ পরে। বলে,—ঘরটা সাফ করলেই কী কাজটা শেষ হইল? চাল দেখ নাই, চাঁদ দিখা যাবেক্।

—তাই যাক—তোমার সাঙাত্ রাত ভোর চাঁদই দেখুক,—মঞ্জরী বলে,—তেবে তুমি যেন যায়োনা চাল ছাইতে আমার ঘর দুয়ারের খড় নিয়া, হঁ!

বর্জু বলে,—গেরামের কার কাছ থিক্যা খড় কর্জ করবু?

—তার আমি কী জানি। যার দরকার সে যেইতে পারে না লোকের কাছে? আমাদের ইতটা মাথাব্যথা কেনে?

—মাথাব্যথাই ত।—বর্জু বলে,—গেরামে আসলো মানিক্য, কারুর মন দুখাইল নাই, দুখাইল তুমার। তুমি আমারে উয়ার কাছে পাঠাইলে, লয়?

—হঁ, পাঠাইছি। তাথে কী হয়?

বর্জু হো-হো করে আবার হাসে, বলে,—হয় না কিছু। তেবে, তেখন মন দুখাইছে, ইখন কেনে দুখায় না, এইটাই সওয়াল কর্‌ছি।

মঞ্জরী বলে,—তুমার গতিক দেখে। বাড়াবাড়িটা ভালো কথা লয়।

বর্জু বলে,—এই কথা। ঠিক আছে গ, বাড়াবাড়ি আর পাবেক নাই। উয়ার চালে খড় দিবু নাই, রাইতে জল নামলে উয়ারে ডাক্যে আনবু আপনকার ঘরে, হঁ?

মঞ্জরী এইবার ফিক্ করে হেসে ফেলে,—তুমার খালি দুষ্টামী। যাও—খাইবার পরে সাঙাতের আউলাইন্যা চাল ঠিক কর গিয়ে।

হাসতে হাসতে বর্জু একেবারে সটান চলে আসে মানিকের কাছে। বলে,—চল হে মানিক্য, খিচড়ি ঠাণ্ডা হয়।

মানিক বলে,—ক্ষেমা দাও সাঙাত, আর তুমার ঘর যাব নাই।

বর্জু একটু অবাক হয়েই ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে,—ই দেখ, তুমার আবার কী হইল হে? পেটে আগ জ্বল্‌ছে, খাইতে বইস্তে লাজ?

—হঁ। লাজই বটে। তুমি বিশ্বাস কর, আমি জানতাম না, তুমার বউ ইখানটিতে আস্‌বেক।

—তাথে হইছে কী হে?

—তুমি দোষ ধর নাই?

—কাঁয়? দোষ ধরবু কেনে?

—উয়ারে কিছু বল নাই?

—কী বুলব?

—মন্দ কথা।

—কেনে হে? মন্দ কথা বুলব কেনে? আর বুলবই যদি, আমি সোয়ামী, আমি বুলব,—তুমি সি-কথার সওয়াল কর কেনে?

মানিক যেন নিজের কথার ফেরে নিজেই পড়ে এবার। অপ্রস্তুত হয়ে কিছুই সে বলতে পারে না। বর্জু হাসে, বলে,—মানিক্য ভাই, আমার 'ইস' বস্তুটা আছে, তুমার দিক হইতে আমার ডর

নাই। ডর আছে ভিন্ন দিক থিক্যা। আর সেই ভিন্ন দিক কুন্ দিক, সি তুমারে পরে বলবু। না বুললে উপায়ও নাই। মঞ্জরী যেখন ইখানে ছিল, তেখন, রাখু-চৌকিদার শহর থিক্যা খৎ আন্‌লে। জলে ভিজা খৎ, ভালো পড়া যায় না, লাচের দলের খবর আইসছে, আমার যাইতে লিখ্যাছে দাঁতন টিশনে। সিখানে লোক থাইক্‌বে, তার সঙ্গেরে যাবু ইবার কইলকাতা, জলপাইগুড়ি, গৌহাটি,—আরও কাঁহা কাঁহা সব মুলুক।

—বুল্‌ছ কী।

—সত্য কথা। মঞ্জরীরে বলি নাই। উ কাঁদবে। উ আমারে ছাইড়ে থাকতে লারে। কিন্তু, তুমি ভাবন কইরে দেখ, রওনা না হয়ে পারি? দলের কাছে—গুরুর কাছে—কসম্ খাইছি না?

মানিক জিজ্ঞাসা করে,—কিন্তু, কুন্ টিশনের কথা বুললে হে? দাঁতন?

—হঁ। খড়্গাপুরে গাড়ী বদল করতে হবেক্। কইলকাতার দিগরে নয়, উজান যেতেই হয়।

—কেনে? উজানে কেনে? কইলকাতায় যাবে ত, খড়্গাপুরে গাড়ী বদল করলেই ত পার।

বজু হাসে, বলে,—দল কি আমার মতলবে চইল্‌বে? দাঁতন-এ দলের একটা মেইয়ে থাকে, উয়ারে লিতে লোক আইসছে মনে লয়। সি-সাথে আমারেও সঙ্গেরে নিবেক্।

প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা এখানেই পড়ে যায়। আবার তা ওঠে খাওয়া-দাওয়ার পর। ওরা চাল ছাইতে ছাইতে পরস্পর মন্তব্য বিনিময় করতে থাকে। এবার মঞ্জরী তাদের ঘর-দোরের কোনো খড় নিতে দেয়নি। সে তার বদলে নিজে গিয়ে কুঞ্জ প্রধানের স্ত্রীর কাছ থেকে একআঁটি ধার নিয়ে আসে। বলে,—পরে-পচ্চাতে দাম ধইরে দিতে বুইলো তুমার সাঙাতরে, বুইলে দিলম।

বর্জু বলে,—তা দিবে। পুতুলগুলো তৈয়ারী হউক।

—আর হইছে,—বলে মুখ ফিরিয়ে মঞ্জরী চলে যায় তার ঘরের ভিতর।

ঘর ছাওয়ার কাজের ফাঁকে ফাঁকে বর্জু বলে,—মঞ্জরীরে নিয়ে মন দুখার কুঠে জান? ই গেরাম সি গেরাম মিল্যে দু-তিনটা বুড়া-আধবুড়া আছে, উয়ারা কু-কথা বলে, কু-নজরে দেখে। তুমি সাঙাত সিটি দেখবু। আর দেখবু, আমার মঞ্জরী কষ্ট না পায়।

দিন দুই পরেই পূর্ণিমা।

—আকাশ খুঁজ্যে যতো ভালোবাসার চাউনী আছে, সব একসাথে জড়ো কর্যে পির্থিমীময় ছড়াই দিছে, বুইঝলে? ইমন রাতে তুমি যদি অমন কর্যে কান্দো, তেবে আমার কী দশাটা হয়?—বর্জু শর্য্যা-কিনারে বসে রোরুদ্যমানা মঞ্জরীকে বলতে থাকে, —মানিক্য শিল্পী বটে, উয়ার দিক থিক্যা তুমার ডর নাই বুইলে দিলম। শিল্পী আপ্‌নে পোড়ে, পরকে পোড়ায় না।

কাঁদতে কাঁদতেই মঞ্জরী বলে,—তুমি জানলে কী কইরে?

—ই দেখ, আমি জান্‌ব নাই! বর্জু বলে,—আমিও ত শিল্পী বটে।

মঞ্জরী বলে,—তুমি যাবু না। আমি বুলছি, তুমি যাবু না।

—ছিঃ! কসম খাইছি না?

—আমি জানি না।—মঞ্জরী শুয়েছিল উপুড় হয়ে, বলতে বলতে মাথাটা উঠিয়ে দেয় সে স্বামীর কোলে, বলে,—খৎ আসছে না হাতি! আমারে দিখাও।

হাত বাড়িয়ে জানালার পাশের বেড়ার বাঁখারীতে গোঁজা একটা পোস্ট-কার্ড টেনে আনে বর্জু। ঘরে বাতি নিভে গেছে, কিন্তু জানালা দিয়ে যত রাজ্যের জ্যোৎস্না এসে সারাটা বিছানায় শুভ্র যুঁইফুলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ফুলের রাশির

মধ্যে চিঠিটা আন্দোলিত করে বজুর্ বলে,—হাই দেখ, মিছা বুলি নাই।

মঞ্জরী বলে,—ছুটা দিন হই গেল খৎ আইসছে, আমারে দিখাও নাই কেনে, বুল নাই কেনে?

—তুমার মন দুখাইবে।

—ইখন দুখাইছে নাই?

হেঁট্ হয়ে মঞ্জরীর সিঁদুর-রাঙা সিঁথির ওপরে মৃদু একটি চুম্বন দেয় বজুর্, বলে,—দোষ ধইরো নাই, তুমারে বুলব-বুলব কইরেও বুলতে লারলাম—ক্ষেমা দিবে না?

একটু উঁচু হয়ে দুহাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে মঞ্জরী বলে,—অ গ, তুমি ইবার যাইয়ো নাই—আমার মাথাটি খাও।

এতক্ষণে বজুর্-নটুয়ার চোখ দুটিও বুঝি ছলছল করে ওঠে। সে কথা বলতে পারে না, চুপ করে বসে থাকে।

মঞ্জরীর চোখের জল শুকিয়ে গেলেও সে একভাবে পড়ে থাকে। জ্যোৎস্না রাত্তিরকে দিন ভেবে দূরে কোথাও বুঝি একসময় কা-কা করে ডেকে ওঠে কয়েকটা কাক। মঞ্জরী সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে, ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে,—মর মর! ভরা রাত্তিরকে সকাল ভাবছে মড়ারা!

—বউ!

—কী?

বজুর্ বলে,—আমি ইবার ত্বরা ফির‍্যা আসবু। তুমারে আরও লাচ্ শিখাবু। যাবু আমাদের দলে?

মঞ্জরী বলে,—ছৌ লাচের দলটির মেইয়ে লয় কেনে গ?

বজুর্ বলে,—নামেই ছৌ লাচ্, পুইসা পাবার তরে ইয়ার মধ্যে কেতো লাচ্ আছে মেইয়াদের। কীর্ত্তন-লাচ আছে। আরও কেতো কী!

মঞ্জরী কী ভেবে হঠাৎ বলে ওঠে,—বেশ কথা। আমি যাবু। তুমি আমারে আরও লাচ শিখাও।

এ কথা বহুবার, বহুভাবে বর্জু বলেছে তার স্ত্রীকে, কখনো রাজী করাতে পারেনি। আজ অভাবিত রূপে তার কাছ থেকে সাড়া পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বর্জু। স্ত্রীকে দু'হাতে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলতে থাকে,—সত্য বলছ ?

—সত্য !

চুম্বনে চুম্বনে বর্জু ওকে ভরিয়ে দেয়। সুখে-সোহাগে মঞ্জরী যেন বসন্তদিনের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে।

বর্জু বলে,—বউ ?

—কী ?

—আমার একটা সাধ আছে পূরণ কর না ?

—কী সাধ ?

—বুল্‌ব ?

—বুল না ?

—দেখ, কাল সকালেই চইলে যাবু, নিরাশ করবু না ত ?

—না। তুমি বল না ?

বর্জু ওকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, ঘরের কোণ থেকে ঢোলটা নিয়ে আসে। ওটা দেখেই মঞ্জরী বুঝতে পারে, বর্জু কী পেতে চাইছে! সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ে সে বিছানায়, বলে,—না না!

একটিবার বউ। আমার ইটা সাধ।

—লাজ নাই মোর ?

—কে আছে ঘরে ? আমি ছাড়া ?

—ওই চাঁদটা ?

বর্জু বলে,—উয়ারে থাকতে দে। উ সাক্ষী থাক। দূরে থিক্যা উয়ারেই ত সওয়াল করব,—চাঁদ, তুমি ত জান, আমার মঞ্জরী কিমন লাচ্‌তে পারে!

—ঢোলের শব্দ হইবে যে ?

—হবেক্ নাই। আমি টুকু-টুকু তাল দিব—ধীরে ধীরে—বাইরের 'ফের্‌টা' পাখীটাও শুনতে লারবে। লাচ না গ ?

চাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মঞ্জরী খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়। আঁচলটা ফেলে দেয়, কিন্তু জামাটা খুলতে গিয়েও পারে না। আবার লজ্জা পেয়ে খাটের ওপর ঝুপ্ করে পড়বার উপক্রম করতেই বজু ধরে ফেলে। ধীরে ধীরে মঞ্জরীর জামা চলে যায়,—কাপড় চলে যায়—কী এক মৃদু সঙ্গতির ছন্দে ছন্দে তার শরীর দুলতে থাকে, হেলতে থাকে, ঘুরতে থাকে।

আকাশে চাঁদ দুষ্টুমী করে জানালার ঠিক মুখোমুখি সরে আসে। 'পিথিমীর যতো ভালবাসা'—সব যেন সে উজাড় করে ঢেলে দিতে থাকে ওদের ছোট্ট ঘরখানার ভিতরে।

কিন্তু তার কণা বুঝি ছিট্‌কে গিয়ে পড়ে আরেক ঘরেও। তাড়াতাড়ি চোরের মতো ছুটে আসতে গিয়ে বুকটা তার ধড়াস ধড়াস করছে, অপ্রসন্নের মতো বসে পড়ে দাওয়ার ওপর। কী সে দেখে এলো? মানুষের দেহ এতো সুন্দর? এতো আশ্চর্য আর দিব্য বিভা ফুটে বেরুতে পারে এমনি মানুষের ছন্দ-হিল্লোলিত সত্ত্বা থেকে?

কতো দণ্ড, পল, অনুপল কেটে যায় কে জানে, সে চুপ করে একভাবে দাওয়ায় বসে থাকে। যুগপৎ চুপ করে দাওয়ায় থাকতে থাকতে চাঁদকে সে জিজ্ঞাসা করে কিসের এক আনন্দে আর বেদনায় তার চোখ ছলছল করতে থাকে। চাঁদের দিকে মুখ তুলে সে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে,—কী দেখ তুমি চাঁদ? কোন্ ঘরে উঁকি দিয়ে কী তুমি দেখতে পেইলে, বুলতে পার? উয়াদের দুটির পরাণে যতো পীরিতি আছে সব দিয়া দাও, উয়ারা যেন কেউ কোনদিন ভিন্ন দিকে মন না দিতে পারে! উয়াদের এক কইরে দাও চাঁদ, সিথানটিতে ঝড় তুইল্যো না। কালে-কালে বয়স উয়াদের বাড়বেক, তেখন যেহ যেই বয়স আসবে, সেই-সেই বয়সকার মতো ভালবাসা উয়াদের দিও, আমি সেই ভালবাসার পর-পর রূপগুলান্ মাটির ডেলার মধ্য দিয়ে ধইরে রাখবু, আমার হাত দুইখান যেন নষ্ট না হয়, চক্ষু যেন নষ্ট না হয়, মন যেন নষ্ট না হয়, প্রাণ যেন নষ্ট না হয়!

কথাটা কানাকানি হতে-হতে শেষ পর্যন্ত কুঞ্জ প্রধানের কানে গিয়েও ওঠে। বর্জু তার নাচের দলে চলে গেছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই, ওর বউটা কষ্টেসৃষ্টে কাল কাটায়,—এর মধ্যে ঐ হা-ঘরে ছেলেটা এসে জুটল কেমন করে? ছেলেটা যে পটুর বাড়ি পড়ে থাকে তা নয়, বরং শোনা গেছে, নিজের ঘরের দাওয়ায় বসেই কী-সব মাটির পুতুল-টুতুল গড়ে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, বর্জু যখন ছিল, তখন সাঙাত-সাঙাত করে এতো তোর ঢলাঢলি কেন বাপু? সেই বন্ধুত্বের সূত্র ধরে তোর ঘরে-দোরে আসা-যাওয়া করতে ওর কতক্ষণ?

প্রধানের স্ত্রী মধ্যবয়সী গিন্নীবান্নী মানুষ, তাকে মেয়েটা খুড়ী বলে ডাকে। সে কর্তার সংশয়ের কথা শুনে মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে ওঠে, বলে,—বুড়া বয়সে ফুসমন্তর শুইন্যে আটাল-পাটাল কর নাকি? কোন্‌ গতর খেউক্যা তুমার কান বিষাছ্যে গ? হরি টিকাইত? আসুক পাতঃকালে ফুল-তুলসী দিতে, উয়ার বাকী দাঁত কটাও নোড়া দিয়ে ভাইঙে দিবু।

—আই দেখ,—কুঞ্জ বলে,—ডাক পাড়ো কেনে? ঘরে ছেলে-মেয়ে-বউ-লাতি-লাতনী, কথাটা কি উয়াদের শুনা ভালো? পঞ্চায়েৎ বুইলে কথা, আমার ত কথাটা বিচের করতে নাগে।

খুড়ী বলে,—বিচের কইরবে ত মণ্ডলীতে যাও না কেনে? ঘরে আমার কাছে বিড়ির-বিড়ির কর কাঁয়?

—আই দেখ, খাওার হইলে ত?

—হইব না? খুড়ী বলে,—পটু—রোজই ত আসে। বলে,—সুখীর মা আমার কাছে থাকে। ঢঙ কইরে তুমার জামাই সাঙাত পাতাই গিছে, সি-সাঙাতের আমি দেখবু কাঁয়, খুড়ী? সাঙাতটা কী মরদ-ছা? মরদ-ছা হবে, ত, ক্ষেত-খামারে খাটবে, ঘরকে পুইসা আইনবে। তা লয়, ইটা কী? মাটির পুতুল গইড়ছে।

গুপীনাথপুরের মিলায় বিকাবে। মানুষের হাতে নাই ট্যাকা, পেটে নাই অন্ন, পুতুল কিনবে কিমন কইরে?

কুঞ্জ প্রধান হুঁকোয় টান দিয়ে বলে,—সত্য কথা।

খুড়ী বলে,—তেবে? পটু আমাদের তেমনটি লয়। বলে,—খুড়ী, কর্জ দিয়াছি সাঙাতরে, সুখীর মারে পাঠায়ে সুদে-আসলে ট্যাকা ফিরত নিবু। আমার কাছে দান-খয়রাৎ নাই। আমি কি তুমার জামাইয়ের মতো মন-উচাটন বটি?

কুঞ্জ বলে,—কথাটা মিছা লয়। পটু শক্ত মেইয়ে বটেক্। উয়ার কাছে ট্যাঁ-ফুঁ চলবে নাই।

—তেবে?—খুড়ী বলে,—উয়ার নামে আ-কথা কু-কথা ওঠে কাঁয়?

—না না—সি-সব লয়,—কুঞ্জ বলে,—বুড়াদের ভাবন বইলে একটা কথা আছে ত বটে?

খুড়ী বলে,—বুড়ারা বুলবে না কেনে? কচি মেইয়েটার উপর উয়াদের টাঁক আছে যে!

—আই দেখ!—কুঞ্জ বলে,—কী কথায় কী কথা এইসে পড়ল?

খুড়ী বলে,—এ-দিগরে অমন মেইয়ে দিখাও দেখি।

সত্য কথা?—কুঞ্জ নিশ্চিন্ত হয়ে হুঁকোটায় শেষ টান দিয়ে উঠে পড়ে, বলে—চাদরটা দাও, পাগ্ বাঁধি।

—কাঁয়?

কুঞ্জ বলে,—গুপীবল্লভপুরে যাইতে হবেক্। ম্যাজিস্টর সাহেব আসবেক, আরও সব কারা-কারা আসবেক, ডাক পড়ছে। ই গেরাম নিয়ে কী-সব জরুরী কথা আছে বটে।

—এই লাও,—খুড়ী বলে,—ফিরবে কখন গ?

কুঞ্জ বলে,—সন্ধাকালে।

—তা দুমুট খাইয়ে যাবে না?

—না গ,—কুঞ্জ বলে,—চিঁড়ে-মুড়কী বাঁইধে দাও, শহরে গিয়ে

ফলার করা যাবে। ই সাত-সকালে অন্ন খাব কি গ? অন্ন ফুটাইবেই বা কখন?

—কাল রাইতে বুললে নাই কেন?

—আই দেখ, সব কথা সব সময়ে মনে থাকে নাকি?—কুঞ্জ বলে,—কথায় বলে, 'মোড়লের মাথা, সাতাশ' ছুঁচে গাঁথা।' দাও দেখি, পাগের চাদর দাও, মাথায় বান্ধি।

হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ী,—কুঞ্জ প্রধান গ্রাম থেকে বেরুবার মুখেও কী মনে করে একবার ঘুরে এলো। ঘুরে এলো নিজের বাড়িতে নয়, হরতকী গাছটার পাশ দিয়ে একেবারে মানিকের কাছে। মানিক তখন দাওয়ায় বসে রাশি রাশি পুতুল-মুখ তৈরী করছে। সেই পদ্ম-পাপড়ি ঠোঁট, সেই তিলফুল জিনি নাসার অগ্রভাগের দুধারে দুটি মুক্তোর বিন্দু।

কুঞ্জকে প্রণাম করে মানিক উঠে দাঁড়াতেই কুঞ্জ বলে,—পুতুলের মুখ কর্যাছ দেখি, ধড় কই?

—হবে।

কুঞ্জ বলে,—দেবী মুখ গড়্যাছ? তেবে বুঝি রাধিকা? কিষ্ট গড়, কিষ্ট গড়, রাধাকিষ্ট মেলায় ভালো বিকৃবে মনে লয়। কিন্তু কথাটা কী জান, কয়টা পুইসাই বা আইস্‌বে? তার থিক্যা ক্ষেতি কাম অনেক ভালো। মাহিন্দার হইতে চাও, ত, কাল আমার সাথে দিখা কর, হুঁ? বলি, পেটে ত দুইটা পড়া চাই? শরীল খান ত ভালো ঠেক্‌ছে নাই।

—আপনকার আশীব্বাদে ঠিক হইয়ে যাবে।

—হউক,—কুঞ্জ প্রধান বলে,—চলি হে। আমাকে আবার শহরে যাইতে হইচ্ছে।

বলতে-বলতে কুঞ্জ সরে যায়, হরিতকীতলার পাশ দিয়ে মাঠের দিকে এগিয়ে আল পার হয়ে বড়ো সড়কটা ধরবে বুঝি।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায় মানিক। আকাশটায় কে যেন আজ নীল বড়ি গুলে দিয়েছে। কে বলবে এটা শ্রাবণের

আকাশ? ক্ষেতের আল্ বন্ধন করা আছে, জল শুষে নিলেও মাটি ভিজে, মাথায় গাম্ছা বেঁধে লোকেরা সব কাজ করছে, এখান থেকেই দেখা যায়।

এই নীল আকাশে এক সময় সূর্য মাথার ওপরে উঠে আগুন ছড়ালো, আর তারপরে এক সময় পশ্চিম দিগন্তে ডুবে গেল। মহিন্দররা গরু নিয়ে এলো মাঠ থেকে, গৃহস্থের ঘরে লাঙল-গরু তুলে দিয়ে মা-ঠাকরুণদের কাছ থেকে কিছু চাল চেয়ে নিয়ে এসে নিজের নিজের ঘরে হাঁড়ি চড়ালো। টিকাইতপুরের এ-পাড়ায় এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। মোড়লের কথা বাদ দিলে, হাল-গরু আছে মাত্র দু'তিন ঘরে, আর আছেও এক জোড়ার বেশী নয়। বাকী যারা, তারা হাল-বলদ ভাড়া নিয়ে ক্ষেত চষে। গাই-গরুও আছে অম্নি দু'তিন ঘরে, বাকীরা সঙ্গতি মতো দুধ কিনে আনে। ঐ দু'তিন ঘর-এর সঙ্গেই শহরের কর্তাদের দহরম-মহরম, বাকীদের তারা চেনে না, চিনতেও চায় বলে মনে হয় না। এলে-গেলে সেলাম নেওয়া ছাড়া তাদের আর বুঝি করণীয় কিছু নেই। ঐ দু'তিন ঘরই নয়া পয়সার যুগে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, ঐ দু'তিন ঘরই মণ্ডল-এ কর্তৃত্ব করে, ঐ দু'তিন ঘরই ক্ষমতার বলে বাকীদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। যারা মহা-মূর্খ তারা বলে ওঠে,—জমিন্দার গিয়ে ইখন মণ্ডল হইছে। জমিন্দারদের ছিল ট্যাকা, ইয়াদের হইছে ক্ষ্যামতা,—হরে-দরে সেই কাশ্যপগোত্তর।

এই ক্ষমতাবান্দেরই একজন হচ্ছে কুঞ্জ প্রধান। ঘরে ছ'জোড়া বলদ, চার জোড়া গাই-গরু। শহরে গেলে বাবুরা খাতির করে চেয়ারে বসায়। বসিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে, আর ক্ষমতাবান ব্যক্তি অম্নি গলে যায়। বাবুরা যা বলে, মণ্ডল-এ এসে তা-ই করে। সবাই ওদের মানে-গনে, ভয়ে টুঁ শব্দটি করে না। হরি টিকাইতদের মতো মথা নেড়ে শুধু বলে,—তা পরধান হচ্ছো তুমি, তুমি যিটা ভালো বুঝবে তাই করবে।

পরধান তখন সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—তা হইলে

ঐ কথাই থির, যা বুললাম, সিটাই তুমরা মেনে লিলে, কিমন ?

কী করে যেন সভায় দুটো-একটা 'মহামূর্খ' জুটে যায়। তাদের মধ্যে কেউ যদি কিছু উল্‌টো-পাল্‌টা বলে বসে, তাহলে অম্‌নি চীৎকার—চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। আসলে গ্রাম্য লোক, চাষ-বাস করে খায়,—হট্টগোলের মধ্যে কথার খেই হারিয়ে ফেলে। তখন আর হাসাহাসির অন্ত থাকে না, চারিদিক থেকে 'চুপ দে—চুপ দে—বইসে পড়' রব ওঠে। পরধান তখন বাবুদের ইচ্ছার রেকর্ড নিজের কণ্ঠস্বর দিয়ে বাজিয়ে যায়, বাবুদের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে। কুঞ্জ সেদিনও সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল বাবুদের কোনো অভিলাষকে কার্যে পরিণত করবার ব্রত নিয়ে। ছেলে সুবলকে ডেকে দাওয়ার বসে গুড়ুক হাতে নেয়, বলে,—বইস হে, কথা আছে। কাল-পরশু একদল বাবু আসছে গেরামে, কুণ্ঠে থাকতে দিয়া যায় বল দেখি ? যে-সে বাবু লয়, কইলকাতার বাবু—খাতির-যত্নে রাখতে হবেক। থাকবে মোটে একটা দিন, কিন্তু দেখ বাবা, তোমাদের গ্রামের নামটি যেন ডুবে নাই।

সুবল বলে,—আইস্‌ছে কেনে ?

কুঞ্জ বলে,—সিটা আমি জানি না। গেরামের মাঠ-ঘাট দেখবে, জরিপ টরিপ করবে।

—জরিপ করবে!—সুবলের চোখদুটি বুঝি কপালে ওঠে,—জরিপ কাঁয় ? ই যে সব্বনাশ কথা।

কুঞ্জ অল্প-অল্প হাসে, বলে,—সি ডরটি নাই। বাবুদের সাথে শলা কইরে আইস্‌ছি। ই ব্যাপারটা অন্য। আমাদের ক্ষেতি আর ঘরদুয়ারের নথি দেখবে নাই, কলকারখানাও বানাইবে নাই। বাবুরা বুললে,—মতলব কিছু নাই, ধর না কেনে, গেরামের সভা (শোভা) দেখবে ?

সুবল আস্বস্ত হয়, বলে,—তেবে মণ্ডল-এর ঘরেই রাখ না কেনে ? পাকা ঘর—বড়ো বড়ো জানালা-দরজা আছে।

কুঞ্জ বলে,—দূর হবে যে! বাবুরাই পাড়ায় আইস্যে থাকতে চায়। কী করবু, আমাদিগের আটচালা ঘরখান ছাইড়ে দিবু?

সুবল একটু চিন্তা করে, তারপরে বলে,—কথা মন্দ লয়। রাইখতে হইলে আটচালাই ভালো, বাবুরা মাটির ঘর হইলেও তারিফ করবে।

কুঞ্জ হাসে, বলে,—অ সুবলের মা, শুনো, বেটা কী বলে। দু'দিন কোর্ট-কাছারী গিয়ে বেটা কথা শিখ্যাছে বটেক্।

সুবলের মুখে ফুটে ওঠে আত্ম-প্রসাদের হাসি। কুঞ্জ বলে,— গাঁট্রী খোল। বউমারে ডাক্। শাড়ী এইন্যেছি বউমার তরে। দুই কুড়ি ট্যাকা দাম। দুকানী বুললে,—লাইলন-শাড়ী!

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসতে চায় না। জানালা দিয়ে দ্বিতীয়ার জ্যোৎস্না এসে বিছানা প্লাবিত করে দিয়ে গেছে। জ্যোৎস্না যেন গা পোড়ায়, চোখ জ্বালা করায়। তেরছা-পানা চাঁদের দৃষ্টি নষ্ট-দুষ্ট মানুষের মতো মঞ্জরীর শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে। কেয়া-হুয়া—কেয়া-হুয়া ডেকে গেল মুখপোড়া শিয়ালগুলো, বিছানায় উথাল-পাথাল গড়ান দিয়েও মনের দুখ গেল না মঞ্জরীর, চোখেও ঘুম এলো না।

নিচে চাটাইটার ওপরে কাঁথা পেতে দিব্যি নিদ্রা দিচ্ছে সুখীর মা। ওকে দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলে কেমন হয়? ও বলবে,—কী হইল মা? চোর আইস্ছে নাকি!

মঞ্জরী বলবে,—হুঁ মাউসী, ভাবের চোর।

মাউসী রঙ্গ করে হাসবে, বলবে,—গতর ভইরে জৈবন পুষে রাইখেছিস, আনাচ্ কানাচ্ দিয়া চোর ঘুরঘুর করবেক নাই? তা মরদটা কে গ? পরের বউয়ের দিকে দিষ্টি?

—চুপ চুপ!—বলে তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরবে মঞ্জরী, বলবে—মানুষ লয় গো, ছায়া।

সুখীর মা এবার জোরে-জোরেই হাসবে, পানের বাটা টেনে

নিয়ে পান সাজবে, পান মুখে পুরে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে পিক্ ফেলে আসবে। তারপরে গুন্ গুন্ করে চাপা গলায় গাইবে—জঙ্গলকু শভা দিশে ফুল যে ফুটিলে, নারীকু যে শভা দিশে যুবতী হইলে।

ভাবতে-ভাবতে শেষ পর্যন্ত সত্যিই উঠে পড়ল মঞ্জরী, ঠেলে তুললো সুখীর মাকে। সুখীর মা অবাক হলো না, এ-পাগলী মেয়ের কাণ্ড সে জানে। দুটো একটা রঙ্গরসের কথা বলে সত্যিই পান সেজে খেলো, সুর করে কী একটা গানও গাইল। মঞ্জরী তখন বললে,—বিছানায় উঠে আইস। তিন পহর রাত হই গেছে, আর ঘুমাই কী করবে? তার থিক্যা তুমার বিত্তান্তটা বল আবার, শুনি?

এ বিত্তান্ত কথা বহুবার বহুভাবে হয়ে গেছে। এক-একদিন এক-এক রকম করে বলে সুখীর মা। বললেও ঘটনার কিন্তু রকম-ফের নেই। জানালার দিকে মাথা করে দুজনে শুয়ে পড়ে পাশাপাশি। সুখীর মা চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ, তারপরে বলে,—ই জিনিসটার এখন চল নাই, আমাদের কালে চল ছিল। ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে গ! আমার তেখন কেতোই বা বয়স। সবে চৌদ্দয় পা দিয়াছি। মা বুললে,—মেইয়ে ডাগর হইছে, ইবার জামাইরে আনতে হয়।

মঞ্জরী বলে,—কয় বৎসর বয়সে তুমার বিহাটা হইছিল যেন?

—হই দেখ, সুখীর মা বলে,—মনে নাই? কেতোবার ত বুলেছি। তখন আমার বয়স—আট। গৌরীদানের মেইয়া আমি। কিন্তু সমাজের রীত, শাশু-ঘর গেলাম নাই। মায়ের জামাই-এর মুখখানা দেখতে কিমন, সিটিও মনে নাই। মেইয়া ডাগর না হইলে জামাই আসবে কেনে? তা বিয়ার ছয় বৎসর পর জামাই আইসে পড়ল। কিন্তু তার আগে আইল গুরুদেব। দিব্যি গোলগাল পুরুষ্টু চেহারা, মাথায় চুল ঘাড় পর্যন্ত। সারাটা দিন

কতো কী পূজা-আচ্চা—রীত-নীত করলেন, সন্ধাবেলা, নতুন কাপড় পরাইয়ে আমারে পাঠাই দিল গুরুর ঘরে। তুমারে সত্য কথা বুলছি মঞ্জরী, আমি বিত্তান্তটা আগে-ভাগে জানি নাই। আমারে সামনে বসাইয়ে কী-সব মন্তর পাট কইরলেন, এক গেলাস সরবৎ খাওয়াইলেন। তারপরে বুললেন,—বিছানায় উঠে শোও আমার তেখন সরবৎ খেয়ে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ কইরছে। ঘর-দুয়ার সব যেন ঘুরতে লাইগ্‌ছে মনে লয়। গুরুদেব লণ্ঠন নিভাই দিয়ে শুধু মিট্‌মিট্‌ পিদীমটি রাখলেন। তারপরে আসলেন বিছানায়। কী যে বুললেন আমার কানে কানে সিটা বুঝলাম না, হঠাৎ আমার কাপড় ধইরে টান দিলেন। আমি চীৎকার করতেই ঘরের বাইরে খোল-করতাল বেজ্যে উঠল, আমার কান্না পর্য্যন্ত কেউ শুন্‌ল নাই।

মঞ্জরী বললে,—তারপর ?

সুখীর মার চোখে জল এসে পড়েছিল, আঁচলের কোণ দিয়ে সেটা মুছতে মুছতে সে বললে,—পরদিন তিনি চইলে গেলেন। তারপর দিন আইসলেন আমার স্বামী। তার সাথে টুকু ভাব হইতেই তারে সব্ব কথা খুইলে বুল্‌লাম। সে শুধু টুকু হাসলো, বুললো,—উয়া আমি জানি। উয়াই ত রীত। তুমি ভাবো কেনে ? তুমি-আমি, আমাদিগের সমাজের সব্বাই ঐ এক রীতে পৃথিবীতে আইস্‌ছি।

শেষ হয় সুখীর মার বিত্তান্ত। শুনতে শুনতে কেমন যেন ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করে আজ বুকের ভিতরটায়। অন্যদিন শুনে হেসেছে মঞ্জরী, কৌতুক অনুভব করেছে, আজ তার শুনে কেমন যেন ভয় হলো মনে। সুখীর মার গায়ে হাত দিয়ে সে মৃদুকণ্ঠে ডেকে ওঠে,—মাউসী ?'

—উ ?

মঞ্জরী বলে,—মানুষটা ইমন কেন মাউসী ? লাচের দলে না গিয়ে পারে না কেনে ? উয়ারে তেখন যেন নিশিতে পায়। একটি

বারও ফিরা তাকায় না, বউটার কী হইল, মরল, না বাঁচল, সিটা আর ভাবন করে না।

সুখীর মা বলে,—তোরে ভালোও ত বাসে খুব ?

—বাসে ত!—মঞ্জরী বলে,—আমি ভাগ্যমানী। কিন্তু ইটা কী বল ত ? আমার মনটা উ বুঝবেক নাই ?

সুখীর মা বলে,—লাচের দলে মেইয়া আছে না ?

—তা আছে।

সুখীর মা হাসে, বলে,—তেবে দেখ, দলের মেইয়ার দিকে টাঁক হইল নাকি ?

বিছানার ওপরে এবারে উঠে বসে মঞ্জরী, বলে,—না মাউসী, না, ই লোক তিমন হবেক্ নাই।

সুখীর মা বলে,—ই দেখ, জামাই আমাদের ভালো মনিষ গ। আমি টুকু রঙ্গ করলাম বটে। তু কিছু মনে লিস্ না মা।

—মাউসী,—বলতে গিয়ে গলা ধরে যায় মঞ্জরীর, চোখের জল উপ্‌চে পড়ে, বলে,—আমি যে তারে ছাইড়ে থাকতে পারি না। আমার পরাণডা কিমন হয় জান মাউসী, যেন ঘানিগাছে মোচড় পইড়্‌ছে।

সুখীর মা উঠে বসে ওকে শান্ত করে। বলে,—ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়াছে,—ভোরটি হয়-হয়—ইখন ঘুমা মা। সকালে উঠবার পর অনেক কাম আছে। এক গঙ্গা কাম ত ক্ষেতটিতেই পইড়ে আছে মা। মানুষ নাই—জন নাই—তুই আর আমি,—দুইটি মাইন্‌ষে দশটা মাইন্‌ষের কাজ করতে হবেক ?

—লাও না আরও মানুষ, মাউসী ?

সুখীর মা চোখ কপালে তুলে বলে,—মেইয়ার কথা দেখ! কুথা পাব মানুষ ? ট্যাকা লেইগবে না ?

—ট্যাকা কেনে ?—মঞ্জরী বলে,—তুমার জামাইয়ের সাঙাত রইছে নাই ?

—আই-আই!—সুখীর মা বলে,—উয়ারে দিয়ে কোনো কামটি

হবেক নাই। মুখ গুঁজরে দিন-রাত পুতুল গইড়ছে? ছিয়া—ছিয়া—উটা কি মরদের কাম গ?

রাগে জ্বলে ওঠে যেন মঞ্জরী, বলে,—ট্যাকা কর্জ লিছে, সিটা শোধ হবেক্ কিমন কইরে? লগদ না দিতে পারে, গতরে খেইটে শোধ দিক।

'তুমি আরেকবার লাইচবার পার না? তুমার চলায় একটা ছন্দ আছে। আমগাছটার তলা দিয়ে তুমি কলসী-কাঁখে কুঁয়োতলা থিক্যা জল আনতে যাও, আমি দূর হইতে দেখতে পাই। তোমার এক হাত কলসীতে, আর অন্য হাতখানা দোলে, সেই দোলনেরও একটা রূপ আছে। তুমি পা ফেইলে ফেইলে হাঁট্যা যাও, যেন, ঢোলকের তালে-তালে চইল্যাছ!'

পুতুল গড়তে গড়তে কখন হাত থেমে গেছে, বুঝি নিজেও জানতে পারে না মানিক্য, বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে কথাগুলি সে বলতে থাকে:

'আমি লাচ্ দেইখাছি একবার কলকাতায়। দেইখে মনে হইছে লাচ্‌টা সাধনা করার জিনিস। লাচের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা সহজ বিপার লয়। লাচে অনেকেই, কিন্তু দু-একজন এমন লাচে, যেন মনে হয়, তার শরীর লাচে, সঙ্গেরে মনও লাচে, প্রাণও লাচে, এমন কি আত্মা-পুরুষও লাচে। ভিত্‌রের লাচ আর বাইরের লাচ তেখন একাকার হইয়ে যায়। তোমারে দেইখে অবধি আমার ই কথাটাই মনে হইছে গ।'

হঠাৎ এক সময় চমকটা ভেঙে যায়। না না, মনের লাগামটা ছেড়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। অবুঝ মন ত ঢিল দিলে আবোল-তাবোল ভাববেই। কিন্তু এটাই বা কী? মনের সুতো ছাড়লে সে ঠিক একটি মানুষের কাছে গিয়েই বা ঘুর ঘুর করবে কেন? মানুষের কথাই যদি ভাবতে হয়ত অন্য মানুষ নেই? তার

মহা উপকারী বন্ধু বর্জুই ত রয়েছে! সেই যে এক কথায় চলে গেল, তার সম্বন্ধেও ত ভাবতে পারতো মানিক্য? কই, সে ভাবনাটিও ত আসে না! ঘুরে-ফিরে সেই একই দরজায় যাওয়া ভিখারীর মতো। কেন? এটাই বা হলো কেন? হবার কারণই বা কী?

এর উত্তর পাওয়া যায় না। মানুষের হৃদয়টা কাঙালের মতো। একবার ভিক্ষা যেখান থেকে মিলেছে, সেখানেই থেকে-থেকে শূন্য ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে। মনটাকে শাসন করেও ফেরাতে পারে না মানিক্য।

ধীরে ধীরে এক সময় উঠে পড়ে।

তাদের পাড়ার দ্বীপটি পেরিয়ে অন্য পাড়ায় যায়। যেখানে কুমারেরা চাক্ ঘুরিয়ে মাটির তালে নিপুণ হাতের কৌশলে ছোট-ছোট খুরী তৈরী করছে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। চাক চালাতে চালাতেই লোকটি প্রশ্ন করে,—কে বট হে?

বাপের নাম নিয়ে নিজের পরিচয় দেয় মানিক। লোকটা মধ্যবয়সী, তার বাপকে বোধহয় চিনতে পারে। বলে,—কী চাও?

—গোটাকতক খুরী। ধরো, দশটা।

—দিবু। দাম দিতে হবেক।

—দিবু।

খুরী কিনে এনে ঘরে রাখে সাজিয়ে। তারপরে তেঁতুল-বিচি জোগাড় করে নিয়ে আসে চেয়ে-চিন্তে। বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে পাহাড়ের দিকে চলে যায়। খুঁজে-খুঁজে গেরুমাটি আর এলামাটি নিয়ে আসে। বহু যত্নে গুঁড়ো করে সেগুলো মিহি করে। তারপরে ছেঁকে নেয় কাপড়ের টুকরো দিয়ে। অল্প জল দিয়ে গুলে দেখে। গেরুমাটি থেকে লাল রঙ পাওয়া যায়, এলামাটি থেকে হল্‌দে রঙ। খড়িমাটিও এ অঞ্চলে খুঁজলে পাওয়া যায়, তা থেকে সাদা রঙ্ হয়। বাকী রইল কালো রঙ্। প্রদীপের শিখার উপরে খুরী রেখে কালো ধোঁয়া জমিয়ে নেয় ঘন

করে,—সে থেকে পাওয়া যায় কালো রঙ্। এবার হাতে রইলো তেঁতুল-বিচি। তেঁতুলবিচি সেদ্ধ করে রঙ্ মিশালেই পাকা রঙ্ হয়ে গেল, রঙের উজ্জ্বলতা বাড়লো।

গোটা কুড়ি মূর্তি হয়েছে। ছোট ছোট এক সাইজের। কুঞ্জ প্রধান এলে দেখতে পেতো, কেষ্ট গড়েনি মানিক, সব রাধিকা। তবে, এ রাধিকা ঘাঘ্‌রা পরা দেবী-মূর্তি নয়। এ-রাধিকা শাড়ী-পরা, বিভিন্ন ভঙ্গিমার। কোনো রাধিকা কলসী-কাঁখে জল আনতে যাচ্ছে, কোনো রাধিকা মালকোঁচার ভঙ্গীতে কাপড় পরেছে হাঁটুর ওপর, পায়ের পিছন দিককার পেশীতে পদ্মের প্রতীক উল্কি আঁকা। এদের রঙ করতেই ওরা যেন সজীব হয়ে ওঠে। সজীব মূর্তিগুলির মধ্যে একটা বস্তু সবার মধ্যেই বিদ্যমান। সব-কটি মেয়েই নৃত্যভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, অথবা নৃত্যভঙ্গীতেই চরণ উঠিয়েছে ফেলবে বলে।

সে বসে বসে আপন মনে রঙ্ করতে থাকে মূর্তিগুলিকে, আর তার সেই রঙ্ করা দেখতে পাড়ার যতো বাচ্চারা এসে ভীড় করে। সব কটিই দিগম্বর-দিগম্বরী, দু'একটি আট ন'বছরের মেয়ে নেংটিপরা। তারও ওপর বয়সী গোটা চারেক মেয়ে আছে, তাদের পরনে শুধু ইজের। মাথার চুলগুলো লাল্‌চে আর জট্-পাকানো, সারা গায়ে ধুলো-বালি। গ্রামের এই পাড়াটা যে কতো দারিদ্র-প্রপীড়িত, তা যেন এই ম্লান মুখ চোখ ছলছল বাচ্চাগুলোকে দেখলে বোঝা যায়। যে-দিন থেকে সে নতুন করে মাটি ছেনে পুতুল গড়তে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই হানা দিতে শুরু করেছিল এরা। প্রথমে একজন-দুজন, তারপরেই ক্রমশই ভীড় বাড়লো। দূর থেকে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বামা-কণ্ঠ শোনা যায়, আর সাড়া দিয়ে দু-চারটি ছেলেমেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটে চলে যায়।

—কে ডাকে রে ?

অন্যরা বললে,—উয়াদের মায়।

ছেলেদের খোঁজ করতে বা ডাকতে বাপেদের কখনো দেখা যায়

না, বা কোনো পুরুষ-কণ্ঠ শোনা যায় না, ভাব দেখে মনে হয়, সব দায়-দায়িত্ব যেন মায়েদের। ওদের ওপর মানিকের ক্রমে-ক্রমে একটা মমতা জন্মে যায়। বলে,—তুমরা পুতুল ভাইঙো না, দিবু তুমাদের একটা-একটা পুতুল। পরে। কিমন?

ওরা খুশী হয়ে মাথা নাড়ে।

সেদিন যখন ওর রঙ-করাই শেষ হয়ে গেল, তখন দুপ্রহর হয়ে গেছে, সারা আকাশটা গুমোট্ করে আছে, বুড়ো আমগাছটা রোদ্দুরের তাপ লেগে ঝিমুচ্ছে,—এমন সময় মানিক উঠে দাঁড়িয়ে কোমরটা টান-টান করে নিলো, তারপরে বড়ো মেয়েটিকে বললে,—খুকী? একটা কাজ করতে পারবু?

খুকী তার ভীরু অথচ কৌতূহলী কপোতাক্ষী দুটো তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বললে,—বল?

আম্‌তা আম্‌তা করে কথাটা পাড়ে মানিক। প্রায় ফিস্-ফিস্ করা কণ্ঠে বলে,—পিছনের বাড়ীটা? ঐ হরিতুকীতলা দিয়ে চইলে যাও।

—কিন্তু কুণ্ঠে? কার ঘর?

মানিক্য বলে,—বর্জু-নটুয়ার ঘর চেনো না?

মেয়েটা বললে,—হঁ, চিনি ত। কিন্তু বর্জু-নটুয়া ত ঘর নাই। বিদেশ গেছে।

মানিক্য হাসলো, বললে,—তা জানি।

—তেবে?

মানিক্য বললে,—বর্জু-নটুয়ার ঘরে এখন থাকে কে জানো না?

ঐ মেয়েটির পাশে যে-মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল সে কলরব করে উঠলো—সুখীর মা থাকে, লয়?

বড়ো মেয়েটি বললে,—হঁ, বর্জু খুড়ার বউও থাকে।

মানিক্য বললে,—তাহলে ত, সে তোমার খুড়ীমা হইল, লয়?

—হঁ তো।

মানিক্য বললে,—তেবে, এক ছুটে যাও তা, বর্জুর ঘরে ?

—খুড়িমারে ডাক্যে নি-আসবু ত ?

—না—না !—যেন মুহূর্তে আঁতকে ওঠে মানিক্য, বলে,—উয়ারে লয়। ঐ যে সুখীর মা, না, কে আছে বুললে ? সে ঘর আছে কিনা, দেইখে আসো।

—ডাকবু ?

—না না, ডাকবু না, শুধু দেইখে আসো।

দুটি মেয়ে ছুটে গেল। এবং ফিরে আসতে বেশী সময় লাগলো না ওদের, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—সুখীর মা নাই—কাজে গেছে।

—তুমার খুড়ীমা ঘরকে আছে না ?

—আছে।

—সওয়াল করল না কিছু ?

—করল। বুললে,—ডাকছে কে ? আমি বুললাম,—মানিক্য খুড়া।

—উ কী বুললে ?

মেয়েটি উত্তর দেয়,—খুড়ীমা বুললে,—কাঁয় ? সুখীর মারে ডাকে কাঁয় ?

মানিক্য এগিয়ে এসে মেয়েটির হাত ধরে বলে,—তুমার খুড়ীমারে গিয়ে বল, একটা ধামা, কি, চুবড়ীগোছের কিছু আছে ?

মেয়েটি ছুটে যায়। সঙ্গে যায় সেই মেয়েটি এবং আরও দু'তিনটি ছেলে-মেয়ে।

মানিক রঙ্ করা পুতুলগুলি এক জায়গায় জড়ো করে। খরা রোদ্দুরে প্রায় শুকিয়ে গেছে, দু-একটির রঙ্ একটু কাঁচা থাকতে পারে। কাঁচা মাটির পুতুল পাকা করতে পারলে বড়ো ভালো হতো। ধামা বা চুবড়ি করে পুতুলগুলো সে বেচতে যাবে গাঁয়ের দিকে, গাঁয়ের চৌ-মাথায়, যেখানে দোকান-টোকান আছে। পাকা করলে বেশী দাম পাওয়া যেতো।

এইসব সাত-পাঁচ সে ভাবছে, এমন সময় মেয়ে দুটো ফিরে

এলো, ছুট্‌তে ছুট্‌তে নয়, সাধারণ গতিতে হাঁট্‌তে হাঁটতে। যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি ওদের অদৃশ্য বাঁধনে সংহত করে রেখেছে

পরক্ষণে দৃশ্য হলো সেই অদৃশ্য শক্তি। একটা বাঁশের চুবড়ী হাতে নিয়ে হরতুকীগাছের আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়ালো মঞ্জরী। সেই হলুদ-শাড়ী পরা, গায়ে ছোট-ছোট খয়েরী রঙের ফুলের ছাপ তোলা ব্লাউজ। আস্তে আস্তে সে এসে দাওয়ার কাছে দাঁড়ালো, হাতের চুবড়ীটা আন্দোলিত করে বলে উঠলো,—এটা চেইয়েছ কেনে ?

—বাজারে যাবু।

—পুতুল বিক্‌তে ?

—হঁ।

—হই গেছে পুতুলগুলো ? দেখি ?

বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে একটা পুতুল তুলে নেয় চুবড়ীটা দাওয়ার ওপর রেখে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে পুতুলগুলো। মানিক বাকী পুতুল চুবড়ীতে সাজাতে থাকে একে একে।

মঞ্জরী এক সময় হঠাৎ বলে ওঠে,—ইটা কী পুতুল ? ঠাকুর ?

মানিক্য মৃদু মৃদু হাসে, বলে—ঠাকুর হবে কেনে ? ঠাকুরাণী !

—কী ঠাকুরাণী ? লক্ষ্মী ? সরস্বতী ? কিছুই ত মনে না লয়।

উত্তর দেয় না মানিক, মুখ নীচু করে নিজের কাজ করতে থাকে। ইতিমধ্যে বাচ্চাগুলো মঞ্জরীর হাতের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে দেখে, বিরক্ত হয়ে তাদের ও ধমক দেয়, বলে,—এই—সর্‌।

তারপরে, বাচ্চারা একটু তফাৎ হতেই মঞ্জরী বলে,—জুটাইছো বেশ—এক কিল্লি ছেইলাপিলা।

—আমি জুটাই নাই, উয়ারাই আইসে জুট্‌ছে।

মঞ্জরী বললে,—তুমার ঠাকুরাণটি কী লাচছে নাকি গ ?

মানিক্য হাসে, বলে,—বুঝেছ দেখছি !

—লাচছে ! সত্য ?

—হঁ।

মঞ্জরী বলে,—লাচিয়ে ঠাকরুণকে ঠাকরুণ বলে মনে না লয়।

—তেবে ?

মঞ্জরী বলে,—ই তুমার ঠাকুর-ঠাকরুণ লয়। তুমি লাচিয়ে মেইয়া গইড়েছ। বল, সত্য কিনা ?

মানিক্য মুখ নীচু করে মৃদু কণ্ঠে বলে,—হঁ। লাচিয়ে মেইয়ে লয়, লাচিয়ে মাইন্‌ষের বউ।

বুকের ভিতরটা সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে ওঠে মঞ্জরীর। অস্ফুট কণ্ঠে বলে,—লাচিয়ে মাইন্‌ষের বউ লাচতে পারে, তুমারে কে বুললে ?

—কেউ বুলে নাই। আমার ভাবন। লাচ্‌লে কিমনটা দিখাইত ?

হাতের পুতুলটা তাড়াতাড়ি রেখে দেয় দাওয়ার ওপর, তার পরে পারিপার্শ্বিকের কথা সমস্ত ভুলে গিয়ে রোষ-কষায়িত নেত্রে বলে ওঠে,—সত্য বল ! কার পুতুল গইড়েছ তুমি ?

ওর উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমা দেখে অবাক হয় মানিক্য, বলে,— আমার দোষ ধর্‌হ কেনে ? কী দোষ করলাম ?

—কর নাই !—রোষে-ক্ষোভে মঞ্জরীর চোখ ফেটে জল আসে, বলে,—বাজারে গিয়ে বসলেই বুঝতে পারবে! ইয়ারা নয় ছেলেমানুষ, বুড়োরা আছে নাই গাঁয়ে ? চোখ নাই তা'দিগের ? নাকের দু'পাশে পাথরের ফুল দিছ, পায়ের বুড়া আঙুলে আংটি দিছ, তার উপর আছে মুখের আদল। আমি বুঝি নাই কী কইরেছ তুমি ?

মানিক হাত-জোড় করে, বলে,—দোষ নিও না। আমি অতো বুঝি নাই।

দিক্ বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায় মঞ্জরী। সামান্য পুতুল দেখে কোনো বিশেষ মানুষের সাদৃশ্য বোঝা যে কতো কঠিন, সে-সব ওর মনে স্থান পায় না। তার ওপর মানিকও যদি সব-কিছু অস্বীকার করে বসতো, তাহলেও কথা ছিল। ওর মনের সন্দেহটা প্রশ্রয় পেয়ে যেন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো।

হঠাৎ সে পাগলের মতো এক কাণ্ড করে বসলো। মানিকের পুতুলশুদ্ধ চুবড়ীটা টান দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেললো উঠোনটার ওপরে। ছেলেমেয়েগুলো অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো, পুতুলগুলো ভেঙেচুরে এদিকে-ওদিকে ছিট্‌কে পড়লো।

মানিক হতবাক। যা-সে চোখের সামনে দেখলো, তা তার পক্ষে বোধহয় কল্পনা করাও কঠিন ছিল। তাব এতদিনের শ্রম, এতদিনের যত্ন, এতদিনের একাগ্রতা,—সব যেন নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

মঞ্জরীর রোষ কিন্তু ওখানেই শান্ত হলো না, সে দাওয়ার-রাখা শেষ পুতুলটিও আছড়ে ভেঙে ফেললো। তারপরে চীৎকার করে বললে,—আমি তুমাকে ছাড়বো না—আমি এর বিচের চাই—আমি এর বিচের চাই!

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো মঞ্জরী, দু'হাতে মুখ ঢেকে দ্রুত পায়ে সে ছুটে গেল তার ঘরের দিকে।

বাচ্চার দল ভাঙা পুতুলের টুক্‌রো কুড়োতে ব্যস্ত, বড়ো মেয়েটি কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করল না, সে কী মনে করে ছুটে চলে গেল, আমতলার দিক দিয়ে সম্ভবত তাদের নিজেদের ঘরের দিকে।

মানিক্য ধপ্‌ করে বসে পড়েছে দাওয়ার ওপর। সামনে ভাঙা পুতুলের টুক্‌রো নিয়ে ছেলেমেয়ের দল কামড়াকামড়ি করছে, সেদিকে তার মন নেই। সে যেন নিজের চোখে নিজের চিতার আগুন প্রত্যক্ষ করছে! বুকের ভিতরটা গুম্‌রে-গুম্‌রে উঠ্‌ছে কিন্তু চোখে জল নেই। তার ভিতরে বসে একটি অবুঝ মানুষ শুধু নীরবে বলতে লাগলো,—তাউ হোক। আমি আমার ঘর ভেঙে দিয়ে আবার দূর দেশে পাড়ি দেবো। তোমরা সবাই মিলে আমার বিচারই করো—শাস্তি দাও।

সারাটা পাড়া জুড়ে যেন একটা দাবানল তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুখীর মা উঠোনে দাঁড়িয়ে শাপ-শাপান্ত করছে, হরি টিকাইত কথাটা এ-কান থেকে ও-কানে দিয়ে

যাচ্ছে। পাড়ার লোক কোনো কিছু নিয়ে মত্ত হবার একটা সুযোগ পেলো।

কুঞ্জ পরধান বললে,—ই দিকে কলকাতার বাবুরা আইসে পড়লো বলে, আর ওদিকে দেখ ছোঁড়াটার কাণ্ড! ছি ছি—পরের বউয়ের মূর্ত্তি গড়ে তুই কিনা বাজারে বেচ্‌বু? ই—পঞ্চায়েত ডাকাই উচিত। কলকাতার বাবুরা আইসে চইলে যাক, এর একটা বিহিত আমি করবুই।

কুঞ্জর স্ত্রী নাতির ভিজে কাঁথা উঠোনের আড়ায় মেলে দিতে দিতে বলে,—মঞ্জরী কিন্তু সতীলক্ষ্মী মেইয়ে, দেখলে তেজটা? পুতুলগুলান্ ভেঙে তবে ছেইড়েছে!

—হুঁ—সে ত বটেই, কুঞ্জ কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে বলে,—কিন্তু, ছোঁড়াটাকে ত গেরামে রাখা যাবে নাই। উয়াকে ডেকে বলতে হবে, তুমি পথ দেখ বাপু।

খুড়ী বললে,—না না, সিটা করবু কেনে? উয়াকে ডাইকে শাসিয়ে দাও, ইমনটা করবু ত গেরামে থাকা হবেক নাই।

—দাঁড়াও, দেখছি,—কুঞ্জ উঠে দাঁড়ায়, তারপরে পাড়ায় বেরিয়ে হরি টিকাইতকে খুঁজে বার করে বলে,—চল ত হে, হা-ঘরে-টার ঘর যাই।

—ইটা কি বুললেন!—টিকাইত বলে,—আপনকার মতো মান্যি মানুষ উয়ার ঘরকে যাবেন কী? ডেইকে পাঠান।

কুঞ্জ একটু ভেবে নিয়ে বললে,—বেশ, তাই হউক। ডেইকে পাঠাও।

পাড়ার একটা ছেলেকে দিয়ে ডেকেই পাঠানো হলো মানিককে। নিজের উঠোনে খাটিয়ে বসে কুঞ্জ হুঁকো টানছে, টিকাইতের হাতেও একটা হুঁকো, তবে, কড়ি-বাঁধানো। মানিক যখন আস্তে আস্তে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো, তখন সারা উঠোন জুড়ে রীতিমত একটা ভীড়ই জমে গেল বলা যায়। বাচ্চা-কাচ্চা, বউ-ঝি, জনকয়েক মাতব্বর ব্যক্তিও আছে।

কুঞ্জ কী ভাবে কথা আরম্ভ করবে, ঠিক করতে না পেরে, একটু ইতস্তত করবার পর ফস্ করে সোজা ভাবেই বলে বসলো,—দোষটা তুমার স্বীকার করছ, বল ?

মানিক এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, একটা কথাও নিজ থেকে বলেনি। কুঞ্জর প্রশ্নের উত্তরে মুখ তুললো, বললে,—কী দোষ ?

কুঞ্জ রেগে গেল, বললো,—সিটা কি বুঝতে লারছ ? এতগুলান লোকের সামনে মুখ ফুটে আমাকে বুলতে হবে ?

মৃদুকণ্ঠে, বিনীত ভঙ্গীতে, মানিক বললে,—আমি ত কোনো দোষ করি নাই।

—ফের মিছা কথা !—কুঞ্জ দাবড়ে ওঠে,—তুয়াকে আমি আমার সঙ্গেরে দেখা করতে বুলেছিলাম। বুলেছিলাম, মাহিন্দার হবি ? তা আসিস নাই কেনে, শুনি ?

একটুক্ষণ থেমে থেমে তেমনি বিষণ্ণ কণ্ঠে মানিক বললে,—মাহিন্দার হইবার ইচ্ছা নাই।

কুঞ্জ জ্বলে ওঠে, বলে,—পরের বউয়ের দিকে নজর দিবার ইচ্ছাটা আছে বটেক, হঁ ?

সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে একটা চাপা হাসির হিল্লোল বয়ে যায়। মায়েরা বাচ্চাদের তাড়া দেয়, চলে যেতে বলে।

কিন্তু বাচ্চারা যায় না, তারাও যেন মস্ত মজা পেয়েছে ব্যাপারটায়।

মুখ তোলে মানিক, তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলে,—ইচ্ছা আছে কি নাই, সিটা বিচের করছেন কেনে ? দোষটা কী কইরেছি, বলেন। বজু আমার সাঙাত বটে, তার সঙ্গেরে আমি বেইমানি করব নাই।

—লিচ্চয় বেইমানি কইরেছিস !—কুঞ্জ বলে,—বউটা এইসে পুতুল-গুলান ভাইঙে দিলে মিছামিছি, লয় ?

মানিক বললে,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবু ?

—কী ?

মানিক ভীড়ের চারদিকে মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে ওঠে,—বর্জুর বউ কি কোনো নালিশ কইরেছে ?

—না, তা করে নাই, তবে আমাদের কানে নানা রকম আইসছে, সিটা কি ভালো ?

মানিক বলে,—কান ত নানা রকমই শুন্‌বার জন্য। কিন্তু তাই নিয়ে কি সত্য কথার বিচার চলে, আপনেই বুলেন ? আমি আপনাদিগের সব্বার সামনে বুলতেছি,—আমি কোনো দোষ করি নাই, কখনো করবু না।

হরি টিকাইত বলে,—বেশ মিট্যা গেল। তু ইবার আইস্যে পরধান-ঘরে মাহিন্দার হ না কেনে ? খাওয়া-পরার কষ্ট ঘুচ্‌বে, মনের আহ্লাদে থাকতে পারবু।

মানিক বলে,—না, মাহিন্দার হবু না—আমি পুতুল গইড়বু—বাজারে বেচবু—একটা পেট ঠিক চলবেক্।

—পুতুল ত ভাইঙে গেছে !

—আবার গইড়ব। আমি ত আর ভাঙি নাই।

ছোঁড়াটা বিদায় নিয়ে মাথা উঁচু করেই চলে যায়, কুঞ্জ প্রধান অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারে না। ব্যাপারটা এখানেই সাঙ্গ না হয়ে আরও ঘোঁট-পাকানো চলতো, কিন্তু রাখু চৌকিদার এসে হাঁপাতে হাঁপাতে এক খবর দিয়ে গেল। এই এত্তো বড়ো একটা গাড়ী কইরে কলকাতার বাবুরা এইসে পড়েছেন, সঙ্গেরে গুটিয়ে মাঈপোয়া,—অর্থাৎ মেয়েছেলে আছে। পরধান মশাইয়ের শীগ্‌গির আসতে আজ্ঞা হয়।

মুহূর্তে পল্লীর হাওয়াটা ভিন্ন দিকে ঘুরে গেল। কোথায় গেল মঞ্জরী, আর কোথায় গেল মানিক, কুঞ্জ দাঁড়িয়ে উঠে ছেলেকে ডাকতে লাগলো। উত্তেজনায় তার পা দুটি থরথর করে কাঁপছে। পাড়ার বৌ-ঝিরা হুড়মুড় করে ঘরে চলে গেল, বাচ্চারা ছুটল গাড়ী দেখতে।

কলকাতার বাবুরা সরাসরি নাকি কলকাতা থেকে এসেছেন বিরাট গাড়ীটা করে। ধুলোয়-কাদায় গাড়ীর অবস্থাও খারাপ। সোজাসুজি গুপীবল্লভপুর হয়ে আসতে পারেন নি। এই বর্ষাকালে 'সুবন্নরেখা' পার হবেন কেমন করে? মেয়েছেলেটির বয়স অল্প, মঞ্জরীর বয়স, কি, তার থেকে দু এক বছরের বড়ো হবে, কিন্তু এখনো নাকি বিয়ে হয়নি। মঞ্জরীর মতো ধবধবে গায়ের রঙ নয়, শ্যামলা দেহের 'বন্ন', কিন্তু সারা গা দিয়ে যেন 'নালিত্য' (লালিত্য) ফুটে বেরুচ্ছে। হাসি খুশী চট্‌পটে ধরনের শহুরে মেয়েরা যেমন হয়, তেমনি। বললে,—আপনি বুঝি প্রধান মশাই। নমস্কার। আজকের দিন আর রাত্তিরটা খুব আপনাদের বিরক্ত করে যাবো। সঙ্গের প্রায় সব বাবুরাই ছেলে-ছোকরা বয়সের, একজনের কাঁধে ওটা কি? বন্দুক। পথে-ঘাটে ঝোপে-জঙ্গলে সাপ-খোপ জন্তু-জানোয়ারের ভয়ও ত থাকতে পারে? তাই ওটা সঙ্গে থাকা ভালো। নই কী প্রধান মশাই?

—লিচ্চয়-লিচ্চয়।

মেয়েটি বাঁধ-ভাঙা ঝর্ণার মতো হেসে উঠলো, বললে,—ভারী মিষ্টি শোনায় ত আপনাদের ভাষা!

ওদের দলে একজনই মাত্র বয়স্ক আর মাতব্বর ব্যক্তি আছেন, তিনিই পেণ্টুল পরেননি, ধুতি পরেছেন, সাদা পাঞ্জাবী পরেছেন, গায়ে চাদর আছে, সে-ও সাদা। চোখে চশমা। হাতে ঘড়ি। তিনি হাসি হাসি মুখে বললেন,—এরা সব আমার ছাত্র।

তারপরে মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন,—এটি ছাত্রীও বটে, কন্যাও বটে।

প্রধানের বদলে মেয়েটিই সকৌতুকে বলে উঠলো এবার,—লিচ্চয়-লিচ্চয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের দলে একটা সম্মিলিত হাসির ফোয়ারা উঠলো। কুঞ্জ অপ্রতিভ হলো একটু। তারপরে বিনীত ভঙ্গীতে বললে,—আসেন আজ্ঞে, আমার ঘরটিতে।

কুঞ্জর ছেলে করিৎকর্মা মানুষ। বাপ অতিথিদের আনতে গেছে, আর ইতিমধ্যে সে তাদের আটচালার বড়ো ঘরটা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার-টরিষ্কার করে গুছিয়ে ফেলেছে। বড়ো একটা মোটা সতরঞ্চি কুঞ্জর কাছে ছিল, পঞ্চায়েতী মণ্ডল-এর পয়সায় কেনা, সেটা সারা মেঝে জুড়ে পেতে দিয়ে বাবার তক্তপোষখানা দেয়ালের একধারে সরিয়ে বড়ো খাটখানা পিছনের দাওয়ায় বার করে দিয়েছে। মাহিন্দার-চাকর-বাকর সবাইকে নিয়ে সে মেতে গিয়েছিল কাজে। শতরঞ্চির ওপরে তুখানা সাদা ধবধবে চাদর টান-টান করে পেতে দিয়েছে। আর মণ্ডল-এর তাকিয়াগুলো দিয়েছে সাজিয়ে একখানা তু'খানা নয়, আটখানা তাকিয়া। সব করার পর ছেলে মাকে হাঁক দিলে। ইতিমধ্যে ছেলে-ছোকরার দল ছুটে এসে খবর দিলে,—এইসে পড়েছেন। 'গোচর'-টুকু পেরিয়ে পাড়ায় ঢুকলেন বলে।

—সঙ্গে মাল-পত্তর আছে?

—তা আছে কিছু কিছু। তু-তুটো লোক আর রাখু চৌকিদার নিয়ে আসছে। সঙ্গেরে আবার গুটিয়ে মেয়েছেলে আছে, জানো?

—বটে! কুঞ্জর ছেলে সুবল চক্ষু কপালে ওঠায়, তারপরে মাকে হাঁক দেয়, বলে,—হেঁই মা—ইয়াড়ে আইসো—ত্বরা আইস। একগলা ঘোম্‌টা দিয়ে সুবলের মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সুবল বলে,—ই দেখ, ঘোম্‌টা দিলে কাঁয়? ইখনও আসে নাই।

সুবলের মা তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা ওঠায়, বলে,—তাই বল্‌ বাপ, ইমন ডাক ডাকিস, বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে।

—করুক গিয়ে, ইদিকে ত্বরায় শুনো?

সুবলের মা বড়ো ঘরে উঠে আসে। ছেলে বলে,—সঙ্গেরে মেইয়াছেলে আছে, কুথাকে শুতে দিবু? ঐ খাটেরে?

—আঁই-আঁই!—সুবলের মা বলে,—একগাদা বেটাছানার সঙ্গেরে মেইয়েছেলে থাকবে কী? তুয়ার হায়া নাই বুলতে?

দেখি, পচ্চিম দিগরের ঘরখানা সাফা করি। বউমা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আমার ঘরে চইলে আসুক।

সুবল বলে,—আসুক। কী আর করা যায়।

দেখতে দেখতে দলটি এসে পড়ে। সাদা চাদর আর তাকিয়া দেখে সবাই আরাম করে বসে পড়ে। বলে,—তোফা-তোফা!

সুবল বাপকে জনান্তিকে প্রশ্ন করে—ইনারা কয়জন?

কুঞ্জ বলে,—চোখে দেখিস না? ছয়জন। বাপ-বিটি, আর ইনারা চারজন। আর একজন আছে গাড়ীতে বইসে, তিনি ডেরাইভার,—তিনি গাড়ীতেই থাকবেন। খালি খাওয়ার সময় ডেকে আনলেই চলবে।

সুবল আবার বলে ফিস্‌ফিস্ করে,—মেইয়াছেলেটার জন্য মা পচ্চিম-ঘরটা সাফা করছে।

—ভালো কথা।

কিন্তু মেয়ে তাতে রাজী হলো না। বললে,—আমি বাবার কাছে শুয়ে থাকবো ঐ খাটটার ওপরে। বেশ বড়ো খাট আপনাদের। একটা রাত ত? ঠিক কেটে যাবে।

শুনে সুবলের মা ত অবাক হয়ে গালেই হাত দিয়ে বললে,—কী রকম মেইয়ে হে?

মেয়ে ততক্ষণে চাদরে আয়েস করে বসে প্রধান মশাই-এর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বললে,—কতো ঘুরে এসেছি জানেন? বারিপদা হয়ে। কোথা দিয়ে কতখানি ঘুরে বারিপদা গেছি তাহলে বুঝুন! তবে ভালোই হলো, বারিপদায় বুড়িবালাম নদী দেখলাম। বারিপদার পর কী জঙ্গল! বড়ো বড়ো সব গাছ! একটাও বাঘ দেখতে পেলাম না, জানেন! জায়গাটা নাকি সাংঘাতিক। ওখানকার লোকেরা জঙ্গল মহাল-এর নামেই ভয় পায়। সেই জঙ্গল মহাল পেরিয়ে, হাতিমারার কাছ দিয়ে টিকাইতপুর চলে এলাম! হাতি-মারা থেকে কাঁচা রাস্তা ত? গাড়ী একেবারে

লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে শুরু করলো। ভাগ্যে এটা স্টেশন-ওয়াগন,—যে কোনো ধকল সইতে পারে!

কুঞ্জ বললে,—ইবার একটু হাত-পা মুখ-টুখ ধুয়ে নেন। চা খাবেন ত? আমাদের ঘরে অতিথ্ অইস্‌লে চা হয়।

—তোফা! বলে দু-তিনজন সোজা হয়ে বসলো।

বন্দুক-কাঁধে ছেলেটি বন্দুকটা এককোণে সন্তর্পণে রেখে দিয়ে মাতব্বর মানুষটিকে বললে,—স্যর, আপনি আগে যান, মুখ-টুখ ধুয়ে চা খেয়ে একটু গড়িয়ে নিন, আপনার ওপর দিয়েই ধকল গেছে সব থেকে বেশী।

—অর্থাৎ ওল্ডম্যান ফার্স্ট, বেশ তা-ই হোক।

সুবলের তদারকীতে সে-কার্যও একে একে সমাধা হলো। মেয়ে উঠে একেবারে সুবলের মায়ের রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত। চটি বাইরে খুলে একেবারে হাঁড়িকুড়ির কাছে। বাড়ীর গিন্নী, বউ আর মেয়েদের হত ভম্ব-ভাব লক্ষ্য করে হেসে ফেললো,—সে বললে,—ভয় নেই, আমরা সব থেকে উঁচু জাত। বামুন। ঘরে ঢুকলাম বলে আপনাদের জাত যাবে না।

—না না—ইটা কী বুলছেন! কুঞ্জর স্ত্রী এগিয়ে এসে পিঁড়ে পেতে দেয়, বলে,—বসুন।

মেয়ে বলে, দাঁড়ান, আগে হাত-মুখ ধুই? চান-টান সারি? ওরা বুড়ি-বালামে খুব নেয়ে নিয়েছে, আমারই শুধু হয়নি।

মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে মেয়েদের যে বেশী সময় লাগে না, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মেয়েদের সবার সঙ্গে জমিয়ে ফেললো, বললো,—আমার নাম শিখা ব্যানার্জী, বুঝলেন? শিখা। কই, বলুন?

সুবলের মা লাজুক-লাজুক ভাবে কোন রকমে বললে,—শিখা।

শিখা বললে,—এইবার হলো ত? এই নামে ডাকবেন।

বড়ো ঘরে তখন চা-পর্ব চলেছে। শুধু চা নয়, মুড়ি-গুড় নারকেলের টুক্‌রো।

শিখা এসে বললে,—বাবা, অন্দরমহল জয় করে এসেছি।

ছেলেদের একজন বললে,—রান্নাঘরের খবরটা বলুন? খুব জমেছে ত?

—তা জমবে না! এলাহী কাণ্ড। প্রধান মশাই কোথায়?

—কোথায় নাকি মাছের ব্যবস্থা করতে গেছেন। সুপক্ক রোহিত মৎস্য।

—এদিকে পাঁঠার মাংস হচ্ছে যে দেখলাম!

ছেলেরা কলরব করে উঠলো,—তা দেখুন-দেখুন মন্দ কী? 'ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম' করে এলেন ত?

শিখা হাসলো। তারপরে বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—ও বাবা, জানো? এরা খুব নিরাশ হয়েছে।

—কেন?

শিখা বললে,—মোটে ছয় আর এক-এ সাতজন? ওরা পনেরোজনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল।

অধ্যাপক ব্যানার্জী হাসলেন, বললেন,—তা তাকিয়ার সংখ্যাধিক্য দেখেই বুজতে পারছি।

শিখা খাটের দিকে তাকালো এবার, বললে,—খাটে আবার বিছানা পেতে দিয়ে গেল কখন?

—এই ত এইমাত্র। তুই তখন ছিলি না।

শিখা বললে,—তা' জলখাবার খেয়ে তুমি খাটে উঠে পড়ো না? আমি তোমার পা টিপে দিচ্ছি।

—দূর পাগলী!—অধ্যাপক বললেন,—আমরা কি আরাম করতে এসেছি? একটি ত মোটে দিন। রাত্রে কোনো কাজ হবে না। কাল ভোরেই আবার রওনা। সুতরাং সময় নষ্ট না করে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

সেই ছেলেটি তড়াক করে উঠে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো, বললে,—আমি স্যর—রেডি।

অধ্যাপক হাসলেন, বললেন,—এতো ব্যস্ত হয়ো না—প্রধান মশাই ফিরে আসুন।

শিখা বললে,—আমি তা হলে আবার মেয়ে-মহলে যাই। যাবার সময় ডেকে নিও।

অধ্যাপক বললেন,—ঠিক আছে। কিন্তু তুই কিছু খেয়ে নিস?

—হ্যাঁ।—বলে শিখা আটচালার দাওয়া থেকে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে তরতর করে অবলীলাক্রমে নেমে গেল।

সারা গ্রাম জুড়ে এত সব কাণ্ড, মানিক কিন্তু তার কিছুই জানতে পারলো না! সে যখন তার ঘরে ফিরে এলো কুঞ্জ প্রধানের বাড়ী থেকে, তখন যেন সে নতুন মানুষে পরিণত হয়েছে। তার ভেঙে-পড়া গুঁড়িয়ে যাওয়া মন যেন চরম ঘা খেয়ে এবার রুখে দাঁড়িয়েছে। প্রধানের বাড়ী যাওয়ার আগে তার মনে হচ্ছিল, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আবার সে পথে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু প্রধানের বাড়ী থেকে চলে আসার পর তার অন্তরে ধ্বনিত হতে লাগলো ভিন্ন এক সুর।

ঘরে এসে হাঁড়িকুড়ি উল্‌টে-পাল্‌টে দেখলো সে প্রথমেই। মনে হলো, যেটুকু চাল পড়ে আছে, এতে রাত্রিটা চলে যাবেই। দেখতে দেখতে ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটের কোণে। এ চাল ত দিয়েছিল বর্জু, হয়ত বা লুকিয়ে-লুকিয়ে, পটু বা পটেশ্বরীকে না জানিয়ে। পটুর কথায় পটুর বাবার স্মৃতি মনে পড়ে গেল। পট আঁকবার কী সখই না ছিল মানুষটার! এলামাটি গেরুমাটি প্রভৃতি থেকে রঙ বার করবার প্রক্রিয়া ত তারই কাছ থেকে শিখেছিল মানিক। পটুর বাবা পটুকে ডাকতো,—পটু—উ—উ। কিন্তু 'উ' উচ্চারণটা ঠিক বোধহয় করতে পারতো না সে, তাই মানিকের কানে শোনাতো,—পটো—ও—ও। ছেলেবেলায় সেইজন্য ওর সঙ্গীরা ওকে ডাকতো, পটো বলে। মানিকও ডেকেছে।

বন্ধুর কাছে ও মঞ্জরী, কিন্তু ওদের কাছে সেই পটোই আছে। কথায় কথায় রেগে উঠতো মেয়ে, কথায় কথায় অভিমান। খেলতে খেলতে খেলার হাঁড়িকুঁড়ি কতদিন না রাগ করে ভেঙে চুরমার করে পালিয়ে গেছে পটো।

এ-সব কথা মনে পড়লে ওর ওপর আর রাগ হয় না মানিকের। রাগ হয়—অভিমান হয় এ-সব কথা নিয়ে যারা কুৎসিতভাবে কানাকানি করেছে, তাদের ওপর। এই রাগ বা অভিমান-এর প্রতিক্রিয়াতেই বোধহয় ইস্পাতের মতো শক্ত আর ঋজু হয়ে দাঁড়ালো মানিক। তার উঠোন থেকে পুতুলের সব টুক্‌রোগুলোই বাচ্চারা নিয়ে গেছে, এমন কি, সেই চুবড়ীটাও নেই! হয়ত তার অনুপস্থিতিকালে সুধীর মা এসে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে! মানিক ধীরে ধীরে সেই বুড়ো আমগাছটার ছায়ায় পাথরটির ওপর এসে বসে পড়ে।

প্রখর রোদ্দুর ধীরে ধীরে একটা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়তে লাগলো। ঝিরঝির বাতাসে আমগাছের পাতাগুলো কাঁপতে লাগলো। ওরা বললে,—তুমি কোনো একজনের মুখের আদলে তোমার মূর্তির মুখ গড়েছো, কোনো একজনের দেহ-ছন্দ থেকে নিয়েছো তোমার মূর্তির সুষমা। সে মূর্তি গড়া হতেও আমরা দেখেছি, আবার ভেঙে যেতেও দেখলাম। যে যাই বলুক, আমরা দেখেছি, তোমার মধ্যে এক অপার্থিব আনন্দের শিখা জ্বলে উঠতে, আমরা শুনেছি এক অশ্রুতপূর্ব আনন্দের ঝংকার—তোমার মধ্যে! তোমার এই আনন্দ-অনুভূতির ক্ষেত্রে আমরা তোমার নীরব সহযাত্রী। আমরা তোমাকে ছায়া দেবো, আমরা তোমাকে সান্ত্বনা দেবো, তোমার ভয় কী? মঞ্জরীর মধ্য থেকে যে-টুকু তুমি নিয়েছো, তাতে কার অধিকার? তার স্বামীর? না। তার সমাজের? তার গোষ্ঠীর? না। সবার সমস্ত অধিকারের সীমারেখা পেরিয়ে মঞ্জরীর যে নিভৃত সত্ত্বা,—তুমি তাকে তোমার শিল্পীর দৃষ্টিতে দর্শন করেছো—তোমার সেই আপন রাজ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে

কোন্ অর্বাচীন? তুমি নিজেকে প্রেমিক ভেবো না, তুমি প্রেমেরও উর্ধ্বের মানুষ, তুমি শিল্পী।

ঠিক এই কথাগুলোই যে ও ভাবছিল, তা নয়,—কিন্তু ওর মনে আসছিল ভীড় করে অনেকটা এই ধরনেরই চিন্তা। আকাশে মেঘ আবার স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগলো, আর ও-ও এক সময় উঠে দাঁড়ালো, মাটি নিয়ে এলো, জল নিয়ে এলো, মাটি তৈরী করতে লাগলো আবার ও পুতুল গড়বে, আবার ও রঙ দেবে, আবার ও ঝাঁকা মাথায় লোকালয়ে যাবে পুতুল বিক্রী করতে।

ক্ষিপ্রহাতে ও ওর কাজ করে চললো। পুতুল যদি ভালো বিক্রী হয়, তখন ও ছাঁচ করে নেবে, সেই ছাঁচ থেকে উঠে আসবে শ'-এ শ'-এ পুতুল। এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ওর মনে হলো, কুচোকাঁচার দলকে আজ দেখা গেল না কেন? তবে কি ওদের বারণ করে দিয়েছে তার কাছে আসতে? তা-ই বা কী করে হবে? ওরা কি কখনো কারুর বারণ শুনেছে? আজ তাহলে হলো কী? ভীড় করে ওরা তার চারপাশে ঘিরে না থাকলে ওর যেন কেমন শূন্য মনে হয় চারদিক। অবারিত প্রকৃতির দাক্ষিণ্য আর নিষ্পাপ শিশু,—এরাই ত তার সব নিষ্ঠা—সব পরিশ্রমের প্রেরণাস্বরূপ।

মানিক্য জানে না, মানিক্য টের পায়নি, কুচোকাঁচার দলকে তখন অন্য এক বিস্ময় এসে টেনে নিয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে কলকাতার বাবুদের প্রায় তিনটে বেজে গেল, তারপরে ওরা আর বিশ্রাম নিলো না, বেরিয়ে পড়লো সদলবলে, সঙ্গে ওদের কুঞ্জ প্রধান, হরি টিকাইত এবং আরও অনেকে। আর সবার পিছনে চলেছে এই সব কৌতূহলী মানবক-মানবিকার দল।

হাঁট্তে হাঁট্তে গ্রাম ছাড়িয়ে ওরা চলতে লাগলো সেই কপাল ভাঙার মাঠের দিকে। খুব অল্প রাস্তা নয়, সংক্ষিপ্ত পথে গেলেও মাইলখানেক হাঁটতে হয় মাঠের কিনারে পৌছতে। কুচোরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, একটা বাবু কাগজপত্র বার করে কী-সব

মিলিয়ে মিলিয়ে লক্ষ্য করছে, ছুটো বাবু লম্বা ফিতে বার করে মাঠটাই মাপতে বসলো নাকি ?

বুড়ো বাবুটা পরধানের সঙ্গে কী-সব পরামর্শ করে আরও এগুতে লাগলেন। এ-বাবুরা এখানে, সে-বাবুরা সেখানে, আর বড়ো-বাবু তার মেয়ের সঙ্গে পরধানের পিছনে-পিছনে হাঁটতে লাগলেন। কুঁচোদের সেই বড়ো মেয়েটা অপেক্ষাকৃত ছোটটির হাত ধরে ওদেরই অনুসরণ করলো। কিছুটা এঁকে বেঁকে জঙ্গলের পথে অগ্রসর হতেই কী একটা দেখে বড়ো মেয়েটা থম্‌কে দাঁড়ালো। সর্ব্বনাশের কথা! উয়ারা কি মা-মনসার থানে চইল্‌ছেন নাকি ? যদি মা-মনসা চটে যান ? উয়ারা পেরাণে বাঁচবেন ? উ পরধান-জ্যেঠা, উয়াদের নিয়ে চল্‌ছেন কাঁয় ? উই যে শাড়ী-পরা কিমন-কইরে চুল বাঁধা হাসি-হাসি মুখ মেইয়েটা জোরে জোরে পা ফেইলে চইল্‌ছে, উয়ারে যদি চোট্‌ মারে ?

কিন্তু সব কথাই বেচারীর মনে-মনে, ওর প্রধান-জ্যেঠা ওদের অন্তরের আকুতি শুন্‌তেই পেলো না। মা-মনসার থানের কাছে দাঁড়িয়ে পরধান-জ্যেঠা উয়াদের কী-সব বুলতে নাগলো। বুড়া বাবুটি একটা ঢিবির কাছে ছুয়েক-পা আগুইয়ে গিয়ে কী-টা যেন দেখতে লাগলেন। আমি পিছনে-পিছনে উয়াদের কাছটাতে গিয়ে দাঁড়িইছি, উয়ারা দেখতে পায়নি। দেখি কী, একটা ঢিবির মাথাটা নাই, সিখান থিক্যা কালা-কালা পাথর একখান উঁকি দেছে। উটাই কি মা-মনসার থান ? উখানে কি গেরামের লোকেরা এইস্যে পূজা-আচ্চা দেয় ?—মেয়েটি পরে তার মায়ের কাছে এসে বর্ণনা দিয়েছিল,—সব আমরা দাঁড়িয়ে রইয়েছি, এমন সময় কথা বুলতে বুলতে বুড়া বাবুটা সেই কালা-কালা পাথরটার কাছে হাতের ছড়িটা দিয়ে মাটি ভাঙতে নাগলেন। যেন কালা-কালা পাথরটার ছাল ছাড়াচ্ছেন। কী বুলবো তুয়ারে মা, পাথরটা আরও বড়ো দিখাতে নাগলো, বুড়াবাবু করলো কী, আরও জোরে-জোরে ছড়িটা চালাতে লাগলেন। আর যাবে কুথায় মা! তুই বুলতে পেত্যয়

যাবি না, হুঁস কইরে একটা হাতির শুঁড় উঠ্যে দাঁড়ালো। পরধান জ্যেঠা ত্বরা কইরে বুড়া বাবুরে যদি ধাক্কা দিয়ে না ফেইলা দিতো উল্‌টা দিকে, তাহলে ভীষণ কাণ্ড হইয়ে যেতো। মেইয়েটা বাপের কাছে ছুট্যে গিয়ে বাপকে হাত ধইরে আরও সরাই নিলো মাঠের মধ্যে, হাঁই-হুঁই চীৎকারে ভেন্ন বাবুরা ছুট্যে আসলেন, কিন্তু কুথায় কে? তেনারে আর দেখা গেল না। যেন ভুঁই ফুঁড়ে উঠ্যেছিলেন। কী কালা গায়ের বন্ন! জানিস মা, ফণাখান কুলার মতো, তুয়ার পিদ্দীমের শিসের মতো লক্‌লক্যা জিভ্‌। আর চক্ষু দুইটা কিমন জানিস? গেরামের সড়ঙ্গী বাবুরি তুই দেখিস নাই? বিদেশে থাকে, মাঝে মাঝে গেরামের কাছারীতে এইসে ওঠে? সেই তেনার হাতে আংটি দেইখেছিলাম। আংটির গোলগাল পাথরটা থিক্যা যেন আলো ঠিক্‌রে পড়ে! ঠিক সেই রকম চক্ষু, বুঝলি মা? আর, ফণার নীচেটা হইছে সাদা সাদা, দাদুর বুকের সাদা চুলগুলোর মতো। যদি বুড়া-বাবুকে চোট দিতেন, বাবু কি পেরাণে বাঁচতেন! ধন্যি সাহস, বুঝলি মা? তা না হইলে কেউ সাধ কইরে মা-মনসার থানের দিকে যায়? না, ছড়ি দিয়ে কালো পাথরের মাটির ছাল ছাড়ায়? তুই-ই বল্‌?

রাতের অন্ধকারে যখন আশপাশের বন-জঙ্গলের জোনাকি জ্বল্‌ছে মিট্‌মিট্‌ করে, ঘণ্টাখানেক মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার পর, এখন যখন জলে-ভর্তি মাঠ আর ডোবায় ব্যাঙের দল গ্যাঁং-গুর-গ্যাঁং করে একটানা সুর তুলে চলেছে, আকাশে যখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মেঘের পর মেঘ ভেসে চলেছে,—তখন কুঞ্জ প্রধানের আট্‌চালায় জোরালো লণ্ঠনের আলোয় বাপের পাশটিতে বসে শিখা ব্যানার্জী বলতে শুরু করেছে,—প্রধান মশাই না থাকলে হয়েছিল আর কী! কী সাপ ওটা পরধান মশাই?

—খারিশ—বাঘা খারিশ।

—সেটা আবার কী? খুব বিষ?

প্রধান অল্প একটু হাসলো, বললে,—বিষ মানে? কথায় বলে,

ওঁয়ার ছোয়ায় বিষ, নিশ্বাসে বিষ। আর রোখও খুব, আপনারা বুলবেন,—যারে বুলে,—জাত সাপ।

ছাত্ররা সবাই নিঃঝুম হয়ে চুপ-চাপ বসে ছিল, একজন বললে,—ওখানে আপনি গিয়ে পড়লেন কী করে, স্যর ?

শিখা বললে,—শুধুই গিয়ে পড়া ? বাবা হাতের ছড়িটা দিয়ে ঢিবিটায় খোঁচা দেয়নি ?

—সত্যি !

—সত্যি ! জিজ্ঞাসা করুন বাবাকে ?

অধ্যাপক একটি তাকিয়া আশ্রয় করে দেহটা একটু এলিয়ে দিয়েছিলেন, এবার বসলেন ভালো করে, বললেন,—আই থিঙ্ক, আই হ্যাভ্ ডিস্‌কভারড্ সামথিং সেন্‌সেশনাল।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠলো সবাই,—কী ! কী সেটা ?

উনি অল্প একটু হেসে বললেন,—এখন বলবো না, লেট্ মি বি ডেড্-সিওর এ্যাবাউট ইট।

বন্দুক যার, সেই ছাত্রটি বললে,—আমরা যা খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই কী ?

অধ্যাপক বললেন,—হোপ্ সো।

মুহূর্তে সবার মধ্যে থেকে নির্জীব ভাবটা কেটে গেল। নতুন করে উৎসাহে যেন জ্বলে উঠলো সবাই। একজন বললে,—আমার এখ্‌খুনি ওখানে ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে।

শিখা বললে,—সর্বনাশ ! প্রাণে বাঁচতে হবে না ? চোখে দেখেননি ত ? ভাবলেও গা শিউরে ওঠে !

অপরজন বললে,—বেশ। তাহলে ভোর হতে দিন।

অধ্যাপক বললেন,—না, আর ওদিকে নয়। ভোরে একদম রওয়ানা কলকাতায়। আবার আসতে হবে, আরও বেশী ইকুইপড্ হয়ে।

ছাত্ররা বললে, আমরাও আসবো ত ?

অধ্যাপক বললেন,—নিশ্চয় ! ক্রেডিট গোজ টু এভরিবডি।

কৌতুক করে শিখা বললে,—লিচ্চয়, লিচ্চয়!

সবাই হেসে উঠলো হো হো করে। কুঞ্জ বললে,—কথাটা দিদিমনির খুব ভালো লাইগছে, দেখি।

ওরা ভোর হতে না-হতেই রওনা দিলো, আর এদিকে মানিক তার পুতুল-গড়ার কাজ নিয়ে বসলো নতুন উদ্যমে। কোথায় গেল খাওয়া, কোথায় গেল নাওয়া,—সে তন্ময় হয়ে মুখ গড়তে লাগলো, টিকালো নাসিকা আর তার দু'পাশে দুটি পাথরের বিন্দু। কোনো দিকে তার কোনো কৌতূহলও নেই, একাগ্র মনে সে তার কাজ করে যেতে লাগলো। শালিখ পাখী কখন এসে তার সামনে উড়ে এসে বসলো, কলরব করলো, আবার উড়ে গেল, তার ঠিকানা নেই।

যে-টুকু চাল কুড়িয়ে-কাঁচিয়ে পাওয়া গেল, তা দিয়ে একবেলা চললো মাত্র।

তারপর বলা যায়, প্রায় অনাহার।

এইভাবে মানুষ কদিন চালাতে পারে?

মাঝে মাঝে তাই সে ভাবে, পুতুল ফেলে রেখে সে কী কারুর বাড়ীতে গিয়ে 'মাহিন্দার' হবে? ক্ষুধার তাড়নায় একদিন কুঞ্জ প্রধানের ঘরের সীমানা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল মানিক। কুঞ্জ বাড়ী ছিল না, লাঠি হাতে নিয়ে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে গুপীনাথপুর গিয়েছিল সরকারী কর্তার সঙ্গে দেখা করতে।

কুঞ্জর স্ত্রী উঠোনে কী কাজ করছিল, ওকে দেখে মাথায় ঘোম্‌টা টেনে একপাশে সরে গিয়েছিল। তারপর ডেকে দিয়েছিল ছেলে সুবলকে, দেখ্‌ত কী চায়?

সুবল এগিয়ে এসেছিল ওর কাছে, হেঁকে বলেছিল, কী হে 'পুত্‌লা গড়ার কারিগর,' কী চাও? কিন্তু কিছু চাইতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তা' আর পারেনি মানিক। অনাহারে কণ্ঠ ক্ষীণ, তবু কোনোরকমে বলেছিল কিছু না। কুঞ্জজ্যেঠার সঙ্গেরে দেখা কইরতে এস্যেছিলম।

কিন্তু কেনে, সিটা বল?

মানিক চোখ তুলে সুবলের দিকে তাকিয়েছিল। তারপরে মুখ নামিয়ে নীরবেই যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গিয়েছিল ফিরে।

ওর চলন-পথের দিকে অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েছিল সুবল, আর হাঁকডাক করতে পারেনি। 'ছেইলেটা যেন কিমন-কিমন,'—সুবল ডাকছিল,'—'কারুর সঙ্গেরে মিশবে না, ঘুরবে না ফিরবে না, ঘরকে বইসে বইসে পুত্‌লা গড়বে শুধু। কী হয় উয়াতে?'

ফিরবার সময় একটু ঘুর পথে চলে আসে মানিক। গাঁয়ে শক্ত পাথুরে-মাটির বাঁধনে যে একমাত্র পুকুরটি স্বচ্ছ জল বুকে নিয়ে টলোমল কর্‌ছে, তার তীর থেকে খুঁজে পেতে কিছু 'কল্‌মী লতা' জোগাড় করে। 'কলমী লতা' এসব যায়গায় পাওয়া যায় না, কেউ কোথাও থেকে বীজ এনে ছড়িয়ে দিয়েছিল বোধহয়। কিম্বা পাখীতেও মুখে করে আনতে পারে। ভিনদেশের পাখী বহুদূর থেকে উড়তে-উড়তে এসে পুকুর পাড়ের ঐ নিষ্ফল আমগাছটার ডালে বসে জিরিয়ে নেয় বটে। তবে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই দেখা যায় ডানা মেলে দিয়ে আবার তারা অনন্ত আকাশের নীলিমায় ভেসে পড়েছে।

তাদের দান কি এই কল্‌মী-লতা? কে জানে।

কল্‌মী-লতা সিদ্ধ করে খেয়ে নেয় পেট ভরে, তারপরে আবার সে তার কাজে লাগে। ওকে দেখে মনে হয়, অদ্ভুত এক মানসিক শক্তিতে নিজেকে উজ্জীবিত করে তুলেছে যেন।

বসে বসে সেই নৃত্যরতা পুতুলই সে গড়ে চললো। দেব নয়, দেবী নয়, সব মূর্তিই তার নৃত্যছন্দে উদ্বেলিত।

গ্রামেরই কার কাছ থেকে একটা জীর্ণ চুবড়ি নিয়ে এলো একদিন। তাপপরে; সেই পুতুলগুলো তাতে ভর্তি করে চলে গেল গ্রামের বড়ো অংশে, রাস্তার ধারে।

কিন্তু গ্রামের মানুষ ওসব মূর্তি কিনবে কেন ?

গোটাকয়েক মাত্র বিক্রী হলো, বিষণ্ণ মনে ফিরে এলো মানিক।

তবু সে দমলো না। পুতুল চুবড়িটা নামিয়ে রেখে আরও মূর্তি গড়তে লাগলো সে। তারপরে আবার গেল বড়ো রাস্তার ধারে। লোকে এসে ভীড় করে, কিন্তু কেনে না। কেউ কেউ বললে,—কিষ্ট, রাধা, লক্ষ্মী, গণেশ, ইসব গড়তে পারিস না ?

মানিক ওদের কোনো উত্তর দেয় না।

সে ফিরে এসে আবার তার কাজ নিয়ে বসে। এইভাবে যে-ক'টি পয়সা সে পায়, তা দিয়ে চিঁড়ে কিনে নিয়ে আসে, জলে ভিজিয়ে লবন দিয়ে খায়।

কেউ তার প্রাত্যহিকতার ওপর সমবেদনার সুর বাজিয়ে যায় না, কেউ একবার আসেও না খোঁজ নিতে।

না-ই আসুক, তার 'পুত্‌লা-গড়া'য় তো বাধা দেয় না। কেউ তো এসে তার চুবড়ি-শুদ্ধ মূর্তিগুলোকে টান দিয়ে উঠোনে ফেলে ভেঙে দেয় না।—এইখানেই তার সান্ত্বনা।

গ্রামের সবাই জানে কী মূর্তি গড়ে সে, এই নিয়ে কানাকানি উত্তাল হয়ে ওঠে,—কিন্তু কোনো অশান্তির ঝড় তাকে এসে প্রহার করে না।

দিনকয়েক পরের ঘটনা। দলে দলে লোক ছুটেছে সেদিন দূরে ঐ কপাল ভাঙার মাঠের দিকে, মা-মনসার থানে। কুঞ্জ প্রধান নিজে এগিয়ে গেছে ছেলেকে নিয়ে, হাতে শক্ত লাঠি। কলকাতা থেকে আবার সেই অধ্যাপক মশাই এসেছেন, তাঁর কন্যা এসেছেন যাঁর নাম শিখা ব্যানার্জী, এসেছেন তাঁর সব ছাত্ররা। কী ব্যাপার ? না, কপাল ভাঙার মাঠে,—মা-মনসার থানে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু পুরাতন যুগের এক দেবমন্দির।

ভয়ানক 'খরা'র দিন ছিল সেটা। জন বিশেক লোক মাথায় কাপড় জড়িয়ে, হাতে কোদাল-সাবল নিয়ে মা-মনসার থান'টাকে

চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে মাটি কেটে ফেল্‌ছে। মাঝে মাঝে হৈ-হৈ একটা চীৎকার উঠ্‌ছে, তারপরে সবাই মিলে দৌড়ে যাচ্ছে একদিকে।

—সাপ-সাপ!

অদূরে দাঁড়ানো অধ্যাপক, তাঁর কন্যা আর ছাত্রেরা সচকিত হয়ে উঠেছেন। কুঞ্জ এগিয়ে এসে বল্‌ছে,—অনেকগুলান সাপ মারা পড়লো।

অধ্যাপকের 'সাপ-মারা'র দিকে ততটা মনোযোগ নেই, যতটা মনোযোগ তাঁর হাতের কাগজপত্র আর ম্যাপের দিকে। রৌদ্র থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য মাথায় হ্যাট্‌ পরেছেন সবাই, শিখা টেনে দিয়েছে ঘোমটা।

ছাত্ররা দু-একজন 'সাপ'-এর ব্যাপারে উৎসুক প্রকাশ করেছে, জিজ্ঞাসা করেছে,—কতো বড়ো? কুঞ্জ তাদের কাছে গিয়ে বলছে,—বেশ বড়ো। সবগুলান্‌ই 'খারিশ'। কামড় দিলে আর দেখতে হবে না।

তারপরেই গলার স্বর একটু নামিয়ে,—ইটা কী ভালো হইল? মা-মনসার থান, আমাদের বুকগুলান্‌ ডরে কাঁপে।

একজন ছাত্র বলে, দেবতার মহিমার কথাটা ভাবুন? তাঁর মন্দিরই বা হঠাৎ দেখা দেবে কেন? এ-ও মা-মনসার ইচ্ছে।

তার কথা শুনে তার দিকে সকৌতুকে দৃক্‌পাত করে শিখা, ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখাও ফুটে ওঠে বুঝি।

কুঞ্জ চুপ করে যায়, বলে,—তা বটে।

অধ্যাপকের সঙ্গে একজন সরকারী মানুষও এসেছেন এবার। তাঁর সঙ্গে উর্দিপরা বেয়ারা, আরও লোকজন। মাঠের অন্যদিকটা—আম্রকুঞ্জের ভিতরে—সব জঙ্গল পরিষ্কার করে সারি সারি তাঁবু ফেলা হয়েছে এবার। সেই তাঁবুতেই সবাই রয়েছেন শুধু অধ্যাপক ও তাঁর কন্যা ছাড়া। কুঞ্জর অনুরোধ এড়াতে পারেন নি, ওরা দুজন রয়েছেন কুঞ্জর অতিথি হয়ে, সেই বড়ো ঘরখানাতেই।

বাস্তবিক পক্ষে, কয়েকটা দিন ধরে সারা গাঁ-জুড়ে উত্তেজনার সীমা-পরিসীমা ছিল না। কপালভাঙার মাঠে মন্দির খুঁড়ে তোলা হচ্ছে একদিকে আর অন্যদিকে সারি সারি তাঁবুর কাছে বন্দুকধারী সেপাই রয়েছে জন দুই, আর ঘুরছে উর্দিপরা আর্দালী, লোকজন, বাবু-সাহেবরা। গাঁয়ের লোক কোন্‌টা দেখবে? ভাঙা মন্দির, না, আগন্তুকদের জাঁকজমক।

একটা তাঁবু অফিসের মতন। সেইখানে চেয়ার-টেবিল পেতে সরকারী মানুষটি তাঁর কাজকর্ম করছেন। তাঁর সামনে বসে কথাবার্তা বলছিলেন অধ্যাপক ব্যানার্জী। টেবিলের ওপরে দুটো বড়ো কাগজ ছড়িয়ে আছে, একটি ম্যাপের মতন, অন্যটি একটি ঐতিহাসিক পট্টোলী'র যথাযথ প্রতিলিপি।

অধ্যাপক বলছিলেন,—এই যে পট্টোলীটির পাঠ উদ্ধার করা হয়েছে, এটি পাওয়া গিয়েছিল কোথায়?

সরকারী মানুষ বললেন,—এই সব অঞ্চলেই। ঠিক এখানটা নয়, সুবর্ণরেখার ওপরে।

অধ্যাপক বললেন,—পট্টোলী বল্‌ছে, জনৈক বিশ্বম্ভর মিশ্রকে ভূমি দান করা হলো। কিন্তু কে এই বিশ্বম্ভর মিশ্র?

সরকারী মানুষ কিছু বলতে পারলেন না।

অধ্যাপক ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের কাগজগুলোর ওপরে। বললেন—এই ছবিটি দেখুন—আমার এক ছাত্র করেছে। এটি এই মন্দিরের সম্ভাব্য আকার ও পরিধি। এটির সন্ধান আমি কিন্তু পেয়েছিলাম পুরানো একটা দলিল-পত্র থেকে।

—হ্যাঁ, সেটা আমি দেখেছি।

অধ্যাপক উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন,—সেটা আপনাকে আমি দেখিয়েছি, না? তাতে এই গ্রামটির উল্লেখ আছে। 'বটগোছালী' ছিল তখনকার নাম, এখন নাম হয়েছে 'টিকাইতপুর।' সম্ভবতঃ গাঁয়ের মোড়ল টিকাইতদের পদবা অনুসারেই এই নামকরণ হয়ে থাকবে। দলিল দেখে আমাদের পক্ষে 'বটগোছালীকে খুঁজে বার

করা কঠিন ছিল। কিন্তু, দলিলে গ্রামের চৌহদ্দির একটা বিবরণ ছিল, আর ছিল মন্দিরটির কথা, মন্দিরটির অবস্থানের কথা। কিন্তু, তাতে দেখুন, মন্দিরের দেবতার নাম ছিল,—'বিশ্বম্ভর'। দান করেছেন গ্রামীন মণ্ডলকে জনৈক চন্দ্রমল্ল। তা' চন্দ্রমল্ল নিয়ে আমাদের আপাততঃ মাথা ঘামাবার কিছু নেই, আসল ব্যাপার যেটা আমাকে টান্‌ছে, সেটা হচ্ছে ঐ 'বিশ্বম্ভর।'

সরকারী মানুষ নিবিষ্ট চিত্তে শুন্‌ছিলেন, বললেন,—তা' বটে। পুরাতন পট্টোলীতে বল্‌ছে 'বিশ্বম্ভর মিশ্রকে ভূমি দান করা হলো, আর দলিলে বলছে,—'বিশ্বম্ভর'-এর মন্দিরের জন্য গ্রামীন মণ্ডলকে দান করা হলো। অধ্যাপক বললেন,—আমার মনে হয়, দুই বিশ্বম্ভরই এক। পট্টোলীতে ভূমি-দানের কথা আছে, দলিলে মন্দিরের কথা আছে। মধ্যে কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে, 'বিশ্বম্ভর মিশ্র' কালক্রমে 'বিশ্বম্ভর' দেবতায় পর্যবসিত হয়ে গেছেন। এরকম নজির আরও আছে।

ওঁরা দুজনে কথাবার্তায় এত মগ্ন যে, বাইরের কোলাহল ওঁদের কানে যায়নি। বাইরে জনতার মধ্যে উত্তেজনার সীমা নেই, শিখা ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাবার কাছে এলো, পিছনে পিছনে আরও দুতিনটি ছাত্র। শিখা হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে,—শীগ্‌গীর এসো বাবা।

দুজনেই চম্‌কে উঠলেন একসঙ্গে, বললেন,—কী ব্যাপার!

শিখা বললে,—ওরা ত যায়গাটাকে মা-মনসার থান বলতো? আসলে তা নয়, আসলে ওটা বিষ্ণু মন্দির। মন্দিরের দেবতার মূর্তি এইমাত্র পাওয়া গেল। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। দেখবে এসো!

বলা বাহুল্য, ওরা তৎক্ষণাৎ ছুটলেন মন্দিরের দিকে।

শুধু ওঁরা কেন, গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সবাই। শুধু এ-গাঁয়ের কেন আশেপাশের আরও বহু গ্রামের লোক। কেউ যে শুধু দেবতা দেখতেই এসেছে এমন নয়, তারা এসেছে কাজের চেষ্টায়, জন-মজুরীর

কাজ যদি কিছু মেলে। আরেকদল গেছে নতুন-কিছু, চমকপ্রদ কিছু দেখবার আশায়। কেউ এসেছে বড়ো সড়ক দিয়ে, কেউ-বা মাঠ ভেঙে।

—কী হচ্ছিছে হে টিকাইতপুর?

—জন লিঁইছে।

কেতো মজুরী?

—তা হবে, সওয়া টাকা, দেড় টাকা।

প্রশ্ন কর্তা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে। সারাদিন কাজ করে সওয়া টাকা, দেড় টাকা পাওয়া যাবে নাকি? তা' কতোদিন চলবে কাজটা?

তা' কেউ বলতে পারে না।

আরেকদলে বকাবকি করেছে,—কী বিত্তান্ত টিকাইতপুরে?

—দেবতা উঠ্ছেন!

—অ্যাঁ!

মাঠের কাজ মাঠেই রইল পড়ে, লোকে দৌড়ে এলো অসীম আগ্রহে। ছুটোর সময় একে অপরকে ডেকে নিয়ে গেল,—আয় আয় দেখ্বি আয়,—দেবতা উইঠ্ছেন! চতুর্ভুজ দেবতা।

কিন্তু মানিক্যকে সেদিন কেউ ডাকেনি, সে কিছুক্ষণ হাত গুটিয়ে বসেছিল তার ঘরের দাওয়ায়। তার ঘরের সামনের ঐ বুড়ো আমগাছটার তলা দিয়ে কতো লোক ছুটে গেল কপাল ভাঙার মাঠের দিকে, শুধু মানিকই রইলো পড়ে। কেমন যেন একটা গুমরে-মরা অব্যক্ত অভিমান বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। তার সব কাজের জিনিস পড়ে রইলো তার সামনে, কাজ করাও তার হলো না।

বেলা বাড়ছে, একটা জলভরা কালো মেঘের টুকরো কোথা থেকে হঠাৎ ভেসে এলো, আবার পরক্ষণেই চলে গেল হাওয়ায় উড়ে। স্থবির আমগাছটার পাশ দিয়ে ছুটো টিয়া পাখী হঠাৎ ডাকতে ডাকতে চলে গেল দূরে।

মানিক সত্যিই অদ্ভুত মানুষ। কুঞ্জ প্রধান বাবুদের নিয়ে ব্যস্ত, নইলে ওকে এসে নিশ্চয়ই ধমকাতো। বলতো,—আবার লাচিয়ে-মেইয়ের মূর্ত্তি গড়ছিস? তুয়ারে গেরামে থিক্যা আমি লিচ্চয় বার কইর‍্যে দিবু।

এতো সব লাঞ্ছনা তার জন্য অপেক্ষা করছে জেনেও মানিক নিজের গোঁ ছাড়েনি। কী এক অন্তর্নিহিত শক্তির বলে সব কিছু প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বোধহয় আজ সে অনড় হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই সব মূর্তি গড়ার মধ্য দিয়ে সে যে আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে, তার বদলে সে সব অপমান—সব নির্যাতন সহ্য করতে বুঝি প্রস্তুত।

এই ধরনের চিন্তার জগতে উত্তীর্ণ হয়ে সে নিজের মনেই উত্তর প্রত্যুত্তর করে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ কী একটা অনুভব করে সে মুখ তুলে তাকালো। তার রিক্ত উঠোনটায় হঠাৎ যেন কার ছায়া পড়েছে। অবাক হয়ে যায় মানিক, এই এতদিন পরে পায়ে-পায়ে তার দাওয়ার একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মঞ্জরী।

সেই হলুদে শাড়ী পরা, সেই বেণী-বদ্ধ কেশরাশি, কিন্তু মুখের ভাব আজ বড়ো স্নিগ্ধ। সেদিন সেই যে মেয়েটি চুবড়ী-শুদ্ধ পুতুল আছড়ে ভেঙে ফেলেছিল, তার সঙ্গে কোমলাঙ্গীর যেন কোনো সাদৃশ্যই নেই! এ যেন অন্য এক মেয়ে। একরাশ শিউলিফুলের মতো তার উঠোনে এসে হঠাৎ প্রফুল্ল হাসির দীপ্তিতে ঝলোমলো করে উঠেছে।

মানিকের মধ্যে অদ্ভুত এক কল্পনাপ্রবণ মন আছে। যতো সে তার কাজ করে চলে, ততই তার মন হয়ে ওঠে স্বপ্নিল। হলুদে শাড়ী-পরা মেয়েটির চলায়-ফেরায়, বাহুলতার ভঙ্গীতে, চোখের কোমল অথচ ঈষৎ তির্যক চাহনীর সঞ্চালনে সে যেন এক আরতি-রতা দেবদাসীর মূর্তি তার সামনে আবির্ভূত হতে দেখতে পায়। যে পুরাতন দেব মন্দির আজ খুঁজে পাওয়া গেল, সেখানেই হয়ত জন্ম-জন্মান্তর আগে মেয়েটি দেবদাসী হয়ে নৃত্যচ্ছন্দে দেবতার

আরাধনা করেছে। কিম্বা হয়ত গৃহবধূ, হয়ত তারই কোনো আপনজন।

—মানিক্য?

সেই আগেকার ডাক? সারা শরীরটা যেন মুহূর্তে শিউরে ওঠে। অস্ফুটকণ্ঠে সে সাড়া দিয়ে বলে,—কী?

মঞ্জরী এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে আরো কাছে এসে দাঁড়ায়, বলে,—তুমি গেলে না?

—কোথায়?

—কেনে, মন্দির দেখতে। সবাই গেছে। কতো লোক আজ সেইখানে। বুঝি মেলা বইসে গিঁইছে।

মানিক ওর চোখের দিকে তাকায়, বলে,—আমাকে ত কেউ ডাকে নাই।

—ডাকে নাই বুইসে কি যেতে নাই?

মুখ নীচু করে মানিক, কোনো কথা বলে না। কী এক নিগূঢ় অভিমান তার বুকের মধ্যে গুম্‌রে-গুম্‌রে উঠতে থাকে।

মঞ্জরী বলে,—ঘরে আজ সুখীর মাও নাই। সে-ও গেছে। মনে হইল, সামনে থিক্যা একটা আড়াল যেন কেউ তুল্যা নিয়া গেল। আমি যেন আর থাকতে পারলাম না, চইলে আসলাম। কেনে জানো? তুমাকে ডাকতে। যাবে না তুমি?

—না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইলো মঞ্জরী। তারপরে হঠাৎ একসময় বললে—তোমার মূর্তিগুলো দেখি?

বলে, ওর সম্মতির অপেক্ষা না রেখে নিজেই এগিয়ে এসে মূর্তি তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো, বললো,—না, আর ভাইঙ্‌বো নাই। জানো, তোমার সাঙাত কোনোবার যা করে নাই, ইবার তা কইরেছে। আমাকে খৎ লিখ্যাছে। আমি সিটি হরি টিকাইত মশ়াইকে দিয়ে পড়াই নিলম। কারে দিয়ে লিখাই নিছে কে জানে। কী লিখ্যাছে জানো? লিখ্যাছে, আমার যেইতে দেরী হবেক্, তুমি আমার

মানিক্য ভাইরে দেখো। উয়ারে লাজ করবে না। পাড়াপড়শী কু' গাইলেও তুমি উয়ার 'বিপার' দেইখো। আমি তুমার স্বামী, আমি বুলি, ইয়াতে কুনো দোষ হবেক নাই। আমি তুমার মনটাও জানি, উয়ার মনটাও জানি।

বুকের ভিতরে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠেছে কী এক আবেগে, কোনক্রমে মানিক বললে,—এই কথা লিখ্যাছে।

মঞ্জরী অল্প-অল্প হাসতে লাগলো, বললো,—হুঁ তো।

আনন্দে—কৃতজ্ঞতায়—ওর চোখে যেন জল এসে গেল, বললে,—সবাই আমারে বুলে কিষ্ট গড়, রাধা গড়, আমি সিটা পারি না, আমার সিটা মন চায় না। আমি মন করলেই তুমারে দেখতে পাই মঞ্জরী।

মঞ্জরী মুখ টিপে-টিপে তখনও হাসছে, বললে,—তুমার কাছেও আমি মঞ্জরী? পটো না?

মনিক বলে বসলো,—আমার কাছে তুমি পটোও বটেক, মঞ্জরীও বটেক। পটোমঞ্জরী।

—আমার মুর্ত্তি গইড়ে তুমি আনন্দ পাও, মানিক্য?

—পাই,—মানিক্য বললে,—আর ত কিছু চাই না, আমারে শুধু তুমার মূর্ত্তি গইড়তে দিও। দোষ ধইরো না। আমারে ইটা না গইড়তে দিলে আমি মইরে যাবো।

মঞ্জরী মুখ নীচু করে, মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে যায়, ধীরে ধীরে চোখের তটরেখায় জেগে ওঠে অশ্রুর বিন্দু। বললে,—সকল সময় ভয়ে-ভয়ে থাকি। সুখীর মা চোখে-চোখে রাখে সব্বসময়। যদি কুনো কথা উঠে। আমার ভয় নাই বটে, আমার স্বামী আমারে ভুল বুঝবে না, কিন্তু তুমারে যদি সকলে আইস্যে চোট্‌পাট্‌ করে?

মানিক্য বললে,—ই ভয়টাও কইরো না। আমি সকলই সইতে পারবু। তুমি শুধু আমার দোষ ধইরো না।

মঞ্জরী ধীরে-ধীরে নিজেকে সামলে নেয়, আবার ঠোঁটের কোণে আগের মতো টুকরো হাসি টেনে এনে বলে,—কিন্তু, তুমি ইয়া কী

করেছো? ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি ছেড়ে আমার মতো মেইয়ের মূর্ত্তি গড়া কি ভালো। বাজারে বিকাবে কেনে?

—না বিকাক্, আমাকে গড়তেই হবেক।

—খাবে কী? শরীলটার কি ছিরি কইর‍্যেছো, জানো?

—কিছু না। ঠিকই ত আছে বটে।

—ঠিক নাই। আমি সব জানি।—মঞ্জরী বলে,—তুমার সাধ হয় আমাকে গইড়ো, কিন্তুক্ বিকাবার জন্য ঠাকুর-দেবতা চাই। আর না পারবু, ত, চাষার ছেলে চাষ করো, বাঁচো।

মানিক বলে,—তুমিও ই কথাটা বুলবে?

—বুলবই ত! বুলব না কেনে!—মঞ্জরী বলে,—আর একটা কথা শুনো। সুখীর মারে বুলেছি, আজ আমার একটা ব্রতের পারণ আছে, তুমি আমার ঘরকে গিয়া খাবেই, হঁ?

মানিক ওর দিকে তীর্যক চোখে তাকায়, কিছু বলে না।

মঞ্জরী ঝংকার দিয়ে ওঠে, বলে,—কী চুপ কইরে আছো? খাবে, হঁ? না কইরো না।

মানিক বলে,—সত্যই কি ব্রতের পারণ?

রাগ করে মঞ্জরী বলে,—হঁ—পারণই ত! আমি আর বক্‌তে পারি নাই বাপু, আমি চললম।

আইস্‌বে কিন্তু, হঁ?

—কখন?

—বিকাল-বিকালই চইলে আসবে। আমি রাঁইধ্‌বো, তুমি কাছে বইস্যে কথা বুলবে। কিমন? বলে ওর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলে মঞ্জরী, তারপরে তেমনি একটা ছন্দোময় গতিতে হেঁটে চলে যায়।

সেই হরতকী গাছটার আড়ালে একসময় ও যেন হারিয়ে যায়।

'বজু' নিজেকে 'ব্রিজনারায়ণ' বলে যতোই জাহির করুক না কেন বন্ধু মানিক ও স্ত্রী মঞ্জরীর কাছে,—আসলে যে-দলের সঙ্গে সে

'নাচিয়ে'-হিসাবে যুক্ত, সেটি সামান্য একটি দল, জনকতক অমার্জিত সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে, কখনো বা শহরের উপকণ্ঠে, মেলায়-মেলায় 'নাচ' দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করে বেড়ায়। কলকাতায় যখন আসে, তখন, হাওড়া-হাটের কাছে, কিম্বা টালিগঞ্জে অথবা বেলঘরিয়া বা ইছাপুরে—রাস আছে, ঝুলন আছে, রথযাত্রা আছে,—এইরকম নানান্ উৎসবকে উপলক্ষ্য করে যে-সব মেলা বসে, তারই এককোণে শততালি-যুক্ত তাঁবুটি ফেলে 'ছৌ' নাচের আসর বসায়।

অবশ্য নামেই 'ছৌ' নাচ, আসলে দুটি-একটি 'ছৌ-নাচ' ধরনের 'ব্যাপার' থাকলেও সঙ্গে জনরঞ্জনার্থ 'খেমটা' ধরনের নাচ ও গানের প্রবলই বেশী। মেলায় জনসমাগম বুঝে বিকেল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত একটা-দুটো করে তিনটে 'শো' থাকে। সেই সব 'শো' শেষ করে 'নাচিয়ে'রা (বা, চলতি কথায়, 'নটুয়া'রা) খাওয়া দাওয়ার পর যে-যার মাদুর বা চাটাইয়ের ওপর 'মড়ার' মতো পড়ে থাকে। একখানা বা দুখানা তাঁবুর মধ্যে যে-ভাবে 'গাদা-গাদি' হয়ে ওরা শুয়ে ঘুমোয়, সে-দৃশ্য নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ওদের পাশে মেয়েদের ছোট তাঁবুটিও ফেলা হয়, সেখানে মেয়েরা সংখ্যায় অল্প বলে, ওরা অবশ্য একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়বার অবকাশ পায়।

কিন্তু কী ছেলে কী মেয়ে, ঘুমোয় সবাই বেলা ন'টা-দশটা পর্যন্ত। তারপরে আড়মোড়া ভেঙে ওঠে। বেলা আন্দাজ দুটো পর্যন্ত ওদের বিশ্রাম বা ছুটি। ম্যানেজার বা মালিকের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

সেদিন বর্জুও ঘুম ভেঙে উঠলো। বাইরে চড়া রোদ্দুর। ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে এলো সে। তার তাঁবুর সবাই তখনো ঘুমে অচেতন, সে-ই উঠেছে সেদিন সবার আগে। কাছের একটা দোকানে গিয়ে চা খেয়ে এলো, তারপরে তাদের তাঁবুর সামনে যে বিরাট ঝাঁকড়া-মাথা জামগাছটা দাঁড়িয়ে রোদ্দুরে পাতা ঝল্‌সাচ্ছে,—তার নীচে, মাটি-থেকে-বার-হয়ে-আসা মোটা শিকড়টার ওপরে

এসে বসলো। তখনো সবাই ঘুমুচ্ছে, এমনকি মেয়েদের তাঁবু থেকেও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

বর্জু সন্তর্পণে তার কোমর থেকে 'গোঁজ'টা বার করলো। গুনে গুনে দেখতে লাগলো, কতগুলো নোট্ তার জমেছে, কতগুলো পয়সা। ঠিক মাসকাবারী মাইনে হিসাবে ওরা কিছু পায় না, 'শো' হিসাবে মালিক ওদের হাতে কিছু ধরে দেয়, যদিও মুখে একটা মাসমাইনের কথা বলা থাকে বটে। দলের 'মাথা'-গোছের 'নটো' যিনি আছেন, তিনি হয়ত পান, আর পায় হয়ত মেয়েরা। বর্জু ঠিক জানে না। সে বা তার মতো আর যে-সব 'নটো' আছে, তারা পায় খুচরো হিসাবে। মালিক বলে,—খাতায় লেখা রইলো, দেখ্‌ছ তো বাজারের অবস্থা, আয়-ব্যয় নেই বললেই হয়, তোমরা 'শো' পিছু খুচ্‌রো খুচ্‌রো পয়সা নাও, নইলে, তোমাদেরও জমে যাবে, আমিও দিতে পারবো না।

ওরা নতমস্তকে তা-ই মেনে নিয়েছিল। না নিয়ে উপায়ই বা কী?

বর্জু আগে আগে যা পেতো, তা দিয়ে নিজের খাই-খরচটাই উঠতো মাত্র, বাড়ীতে পাঠাবার মতো তেমন কিছু থাকতো না। যা থাকতো, তাই দিয়ে দল ছেড়ে যাবার সময় মঞ্জরীর জন্য শাড়ী বা কাঁচের চুড়ি, আলতা. সস্তা স্নো বা চিরুণী,—এইসব নিয়ে যেতো।

আজ কিন্তু বর্জুর সংকল্প বদ্‌লে গেছে। আজ সে প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচা করে, যতো পারে জমিয়ে রাখে। তার গগনস্পর্শী উচ্চাশা, কিছু টাকা জমিযে একফালি 'জমি'র বন্দোবস্ত নেবে, নিজেরা চাষ করবে। সে, মঞ্জরী আর মানিক্য।

'মানিক্য শিল্পী বটে,'—বর্জু নিজের মনেই উত্তর প্রত্যুত্তর করতে থাকে,—'ছোটবেলা থেকেই মঞ্জরীর খেলার সাথী, মনে লয়, উয়াদের দুজনারই মনে 'রঙ' আছে।

—তেবে, তুমি কে হে?

নিজের মনে প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দেয়,—'আমি আবার কে?

আমি একটা 'উপর-পড়া' মনিষ্যি। আমি না আস্‌লে উয়াদের 'মিলন' ঘটতো।

—আস্‌লে কেনে?

—আমি কি জান্‌তম্‌?

এক বর্জু আরেক বর্জুকে বলে,—যাই বলিস, তুয়ারে মঞ্জরী ভালবাসে, ইয়াতে কাঁটা নাই। মানিক্যের উপর তার টান আছে, কিন্তু বেইমানী সে করবে না। মানিক্যও শিল্পী, সে-ও বেইমানী করবে না। মঞ্জরীর তবু বর্জু আছে মানিক্যের আছে কে? উয়ার 'তুষ-পড়া আগুন লাগা' হৃদয়টি ছাড়া? বর্জু এইখানে স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ মানিক্যের জন্য তার মনটা সমবেদনায় মোচড় দিয়ে উঠ্‌তে থাকে।

—আচ্ছা, আমি যদি চিরটা কালের জন্য পালিয়ে যাই? যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যাই? যদি মরে যাই? তাহলে ত, উয়ারা দুজন দুজনের কাছে মিলে যেতে পারে?

—কিন্তু, তুমি কি করবে হে? মঞ্জরী ছাড়া তোমার জীবন ভাবতে পারো?

হাহাকার করে ওঠে বর্জুর অন্তর, না-না তা পারি না।

—তেবে তুমি বউটাকে ছেড়ে এমন করে বাইরে-বাইরে ছুটে আসো কিমন কইরে, অ্যাঁ?

বর্জু নিজেই নিজেকে বলে,—শিল্পী বটি, তাই আসি। বাইরে এসে উয়ার কথা 'ভাবন' করতে ভালো লাগে। ঘরে উয়ার পাশেরে যখন থাকি, তখন উয়াকে 'পাওয়া' হয়, উয়াকে নিয়া 'ভাবন' হয় না।

—আমার মনে লয়, উয়ার দুইটা শরীর আছে। একটা, যা ঘরের ভিতরে দুই হাতে জড়ায়ে ধরা যায়,—আর অন্যটা, যা ছোঁয়া যায় না, যা শুধু ভাবনের মধ্যেই পষ্ট হইয়ে ওঠে।

তাদের একটা নাচ আছে। উথাল-পাথাল গহীন বন। সেই বনে শিকারী গেছে শিকার করতে, সারা দিন কেটে গেছে, শিকার

নাই, সন্ধ্যা হইল, শিকারী পথ ভুল করে বিপথে যেতেই মায়াকন্যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। মায়াকন্যার ভালো লাগলো তাকে, হাত ধরে নিয়ে গেল তার 'অজন-বিজন' কুঁড়েঘরখানিতে, পিপাসা মিটাইতে দিলো 'ফটিক-ঝর্ণার জল', ক্ষুধা মিটাইতে দিলো 'চিকণ ধবল অন্ন।'

তারপরে বললো—আমার কাছে থাকো, তোমারে 'রেশম-বাস' দিবো পরিধানে, হীরা-বসানো অঙ্গুরী দিবো হাতে। 'সুখ-স্বপন' পালঙ্ক দিবো শুইতে, 'মনোরথ অশ্ব' দিবো বনে বনে চড়ে বেড়াইতে।

—তারপর ?

তারপর, সেইদিন শুধু নিশীথে,—যখন ফুট্‌ফুট্যা চাঁদের উপর দিয়া হালকা মেঘের দল রেশম-কাপড়ের মতন উইড়া উইড়া যায়,— তখন চার বাহুবন্ধনে ধরা দিলো মায়াকন্যা, কিন্তু যখন ভোর হইল, পাপিয়া পাখী ডেকে উঠলো, তখন কী হইল ?

দেখা গেল, বুকে তার মায়াকন্যার মোমের দেহটা পইড়া আছে পুতুলটির মতো. ভিতরটা একেবারে ফাঁপা, কিছুই নাই।

পুতুলটা ঠেলে ফেইল্যা শিকারী বিছানায় উইঠ্যা বসে। কোথায় তুমি গেলে, মায়াকন্যা ? অশরীরী উত্তর ভেস্তে আসে,— আমার মায়াশরীর ধর্‌ছো, এইবার ভিতরকার ছায়া-শরীর ধরো দেখি ?

শিকারী আন্দাজে-আন্দাজে ঘরময় হুটোপুটি করে। ঈশানে যায়, নৈঋতে হাসি ওঠে, উত্তরে যায়, দক্ষিণে হাসি ওঠে। পাগলের মতো ঘুরতে থাকে শিকারী, কিন্তু ছায়াশরীরের সন্ধান সে পায় না,—ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে সে নিজেই একদিন ছিট্‌কে বেরিয়ে চলে যায় তার কেন্দ্র থেকে,—ছায়াশরীর তার কোনদিনই পাওয়া হয় না।

নাচের সঙ্গে যে লোকটা ইনিয়ে-বিনিয়ে কাহিনীটা বলতে থাকে, তার কণ্ঠে ঐ ভাষা আর বিচিত্র ভাষাভঙ্গি অপরূপ হয়ে ফুটে ওঠে। শুনতে শুনতে মনটা যেন আপনি এক অদৃশ্য লোকের দিকে যাত্রা করে।

মঞ্জরীর 'ভাবন' করতে করতে আজকার তাদের এই নাচটার কথা মনে উদয় হয় বর্জুর। তাদের দলটা ভালো নয়, পর্দা খাটিয়ে দল বেঁধে 'নাচন-গাওন' করলেও তাদের মধ্যে দলাদলি রেষারেষি লেগেই আছে। কীসের নেশায় সে যে এদের মধ্যে এসে পড়েছিল কে জানে, আজ ছাড়তে গেলেও ছাড়তে পারছে না। আসল কথা, নাচ-গানের ব্যাপারটা ভালো লাগে। ম্যানেজার বা মালিক 'গাওনা' পেলেই তাকে খৎ লিখে 'আনা করায়,' কিন্তু দলের দু'তিনজন ছাড়া সবাই আড়ালে-আবডালে তার নামে মুখ বাঁকায়, বলে—গদার মতন চেহারাটাই আছে, নাচের ও কী জানে?

ঘোর প্যাঁচ জানে না বর্জু, এ-সব বক্রোক্তির বিষস্পর্শে সে রীতিমত ব্যথা পায়, কিন্তু তবু সে ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে পারে না,— এম্‌নি দুর্দৈব।

নিজের মনেই বলে,—আমার চোখ খুল্যাছে গ মঞ্জরী, আমি বুঝি ইয়ারা কেউ আমাকে চায় না, তবু ইখানটিতে কাম্‌ড়ে পড়ে আছি। পয়সা জমা কইরে একদিন 'জমিন্'-এর বন্দোবস্ত লিব, তুমাকে আর পরের ঢেঁকিতে গিয়া পয়সার লেগে পাড় দিতে হবেক নাই, সুখীর মার সঙ্গেরে মিশ্যা পরের ঘরের মুড়ি ভাজতে হবেক্ নাই।

নিজের মনে বসে এইসবই ভাবছিল তন্ময় হয়ে, এমন সময় খিলখিল্ করা হাসির শব্দে চমকে মুখ ফেরালো বর্জু। তার ঠিক পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছে কখন একটি মেয়ে, সেটা সে খেয়ালই করতে পারেনি। তাদেরই দলের মেয়ে, ছিপছিপে গড়ন, ছাব্বিশ-সাতাশের বেশী হবে না বয়স, খ্যাম্‌টা-নাচের সময় কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে এমন ভাবে নাচতে পারে যে, মেলার দর্শকদের মধ্য দিয়ে হৈ-হল্লা শীষের শব্দ উঠবেই প্রতিদিন। শশীকলা দেওয়া হয়েছে ওর নাম, আসল নামটা যে ওর কী, সে সবাই এতদিনে ভুলে গেছে। সে নাম জিজ্ঞাসা করলেও বলে না, মুখ টিপে টিপে হাসে শুধু।

বর্জু অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিয়ে বলে ওঠে,—কী হইল?

হাসছ কেনে? শশীকলা সামনে আসে ওর, বলে,—তোমার রকম দেখে। মরদমানুষ 'ভাম' হয়ে বইসে থাকলে আমার ভীষণ হাসি পায়। তা' নটো মশায়, এত সকাল-সকাল উঠছ যে?

—সকাল কুথায়? নটা বাইজে গেছে লাগ্‌ছে।

শশীকলা মুখ ঘুরিয়ে বলে,—তাম্বু দেখ গিয়া, সব একেবারে নিঝুমপুরী।

—তা' তুমিই বা উঠলে কেনে আজ, সকাল-সকাল?

শশীকলা বললে,—হঠাৎ একটা স্বপন দেইখা ঘুমটা ভাইঙে গেল।

বর্জু নত মুখে চুপ করে থাকে।

শশীকলা বলে,—কী স্বপন, শুধাইলে না?

—কী কাম?

শশীকলা তবু বলে,—তবু শুধাইলে পারতে। স্বপনে দেখলম আমি নদীতে ভাইস্যা যাইছি, তুমি ঝাঁপ দিয়া পইড়ে আমাকে যেন্তে তুললে। কী ভালো না স্বপনটা?

বর্জু বলে উঠলো,—খামোখা আমি তোমায় টেন্তে তুললেম কেনে, আর কেউ ছিল না?

শশীকলা হাসে, বলে—আমি কী করব? স্বপনের উপর কি মাইন্‌ষের হাত আছে?

বর্জু বলে,—তা কী বলতে চাও, বল।

শশীকলা কিছু বলে না, ওর দিকে ছুটি চোখের পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে শুধু।

—এই লাও, চুপ করলে ত?

শশীকলা বলে,—না করে উপায় কী? আমার মনের কথাটি কি তুমি শুন্‌তে চাও?

—মনের কথাটা আবার কী?

শশীকলা দীর্ঘশ্বাস ফেলার অভিনয় করে বলে,—কী আবার! মনে 'রঙ্‌' লাগছে।

—ঈস্।

—'ঈস্‌' না সত্য,—মেয়েটি বলে,—মনটা তো আর দেখানো যায় না, তা হইলে দেখতে পাইতে, সেটা রঙে-রঙে একাকার হইয়ে গেছে।

কৌতুক অনুভব করে বর্জু বলে,—বাস্‌ রে!

শশীকলা কৃত্রিম রাগে ঠোঁট ফোলায়, বলে—'বাস্‌রে' কেনে? কথাটা কি লতুন নাকি? তুমি জানো না?

বর্জু এবার ঠোঁটের কোনে একটু বাঁকা হাসি টেনে আনে শুধু, কোনো কথা বলে না। শশীকলা ওর কাছ ঘেঁষে বসে পড়ে বলে,—তোমার মঞ্জুরীর খবর কী গ?

—খবর আর কী? ভালো।

শশীকলা বলে,—আহা, পুরুষমানুষ যেন কী! বুঝেন না কথা? উয়ার পেটে কিছু আইল? বর্জু হঠাৎ-ই একটু লজ্জা পায় কথাটায়, মুখ ফেরায় অন্যদিকে, তারপরে বলে,—না।

—কেনে! বিহা তো হঞিছে অনেক দিন!

—তা হউক। দুঃখ নাই—ঝাড়াহাতপা ও আছে বেশ।

শশীকলা গালে হাত রেখে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে, বলে,—বল্‌ছ কী! তুমার বৌটা শেষকালে বাঁজা টাঁজা হইল না ত?

বর্জু এবার রাগ করে, বলে,—ই দেখ, উসব কথা বুল্‌বি নাই!

খিলখিল করে হেসে ওঠে শশীকলা, বলে,—পুরুষমান্‌ষের রাগ হইল নাকি?

সত্যিসত্যি রাগ করে এবার উঠে পড়ে বর্জু, হনহন করে এগিয়ে চলে যায় অন্যদিকে। পিছন থেকে শশীকলার ডাক শোনা যায়.—নটোমহাশয়—ও, নটোমহাশয়?

কিন্তু, কে শোনে ওর কথা?

বর্জু হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় উঠে আসে। দোকান পত্তরের জটলা পার হয়ে চলতে চলতে মাঠের ধারে এসে পড়ে। একটা অল্পবয়স্ক বটগাছের মাথায় কয়েকটা শালিক পাখী কলস্বরে কলহ

করছে। বর্জু গিয়ে তার নীচে বসতেই তারা একযোগে নীরব হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

বর্জু ভাবুক দার্শনিকের মতো চুপপাপ বসে রইলো। শালিকেরা আবার কলহ শুরু করলেও তার চিন্তার জাল-বোনায় কোন ব্যাঘাত জন্মালো না। সে ভাবতে লাগলো মঞ্জরীর কথা, শশীকলার কথাও। ছৌ-নাচের দলে যতগুলো মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে শশীকলাই দিনে দিনে তিলে তিলে তার বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতলোক থাকতে শুধু তার দিকে ওর কেন যে এতো লক্ষ্য, এর উত্তর কে দেবে? মেয়েটা সুযোগ পেলেই তার কাছে আসে, আবোলতাবোল বকে, রঙ্গরসিকতা করে, কখনো বা হাত ধরে টানে আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করে। বলে,—নটোমশায়ের হাতের চটা দুইখান এতো শক্ত ক্যানে? হাত বুলালে মনে হয় লোহার উপর হাত রাইখেছি। আঙুলগুলান কিন্তু লম্বা-লম্বা, বেঁটে-খাটো চাষাড়ে লয়।

তারপরই মুখ চেপে হাসে, বলে,—আঙুলগুলান যেন ছুরির ফলা, হাত বুলালে মনে লয়, হাতখান কাইটেই বা গেল বুঝি!

এইসব ধরনের কথা ওর। কিন্তু, তার বেশী নয়। এইসব মেয়ের স্বাভাবচরিত্র ভালো থাকবার কথা নয়, তার সঙ্গে এত মেশে, এত রসিকতা করে, কিন্তু কখনো নষ্ট করবার পথে ডাক দেয় না। একান্তে পেলেই বলে,—নটোমশায় 'রিষ্যিসিদি' মুনি নাকি? তপ করছেন?

বর্জু বলে,—কী মনে লয়?

দুষ্টুমী করে বলে,—মনে আর কী লয়? মন কি আর আছে? ঐ 'আঙা' পায়ের তলায় বিছায়ে দিছি যে! বর্জু নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—'আঙা' বলাটি ঠিক হইল না, ই হইছে 'আঙার'—পুইড়া পুইড়া আঙার হইছে।

—বাস্‌রে! পোড়াইল কে? মঞ্জরী?

—মঞ্জরী কেনে? শশীও ত হইতে পারে।

মুখ ঘুরিয়ে বলে,—শশীরে কি আগুন ঠাউরাইলা? আগুন হইলেত 'পতঙ্গ'রে পুড়াই মার্ত।

—বাকীটা আর রাখলে কী?

—ঈস্!—তাড়াতাড়ি কাছে এসে ওর বুকে হাত রেখে কৃত্রিম আতঙ্কের স্বরে বলে উঠ্তো,—দেখি, কতোটা পুড়্যাছে?

পর মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠতো। সে হাসির সুরে সুর মেলাতো বজু'ও। এটাই ওদের খেলার শেষ। যেন কোন এক দৃশ্যের ওপর যবনিকা নেমে আসা। তারপরে ছুটে যেতো যে-যার কাজে। দলের মধ্যে এ-নিয়ে কানাকানির অন্ত ছিল না, তারা ওদের দুজনের সম্পর্কটাকে দূষনীয় ভাবতো, ওরা তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ করতো না। এ-এক অদ্ভুত সখ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে।

এবং গড়ে উঠেছে বলেই বজু'র মনটা নতুন এক আবিষ্কারে সহজেই বিভোর হতে পেরেছে। সে ভাবে,—তাদের গাঁয়ে মাণিক্যর সঙ্গে মঞ্জরীরও এইরকম সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। পারে কেন, হয়ত উঠেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হলো কতটুকু? মাণিক্যের ধরন ধারণ সে জানে, 'সে শিল্পী বটে।'

বজু নিজের মনেই প্রশ্ন-উত্তর করে,—'মঞ্জরীকে ত তুমি জানো বজু, সে তুমি-অন্ত' প্রাণ, আর মাণিক্য? সে শিল্পী বটে।

—তা বলি আগুন নিয়া খেলাটা ত ভালো লয়!

—শিল্পীমনিষ্য তা পারে। তুমি কী করো ইখানে? শশীকলার সঙ্গে তুমার কি সম্পর্কটা গইড়া উঠ্যাছে, হঁ?

—ঠিক বটে।

—তেবে?

বজু'র মনটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। সে একমনে বসে মঞ্জরীর কথা ভাবে কিছুক্ষণ। তার দেহ-মঞ্জরীর কথা। সেই নিরাবরণ বিদ্যুৎ শিখার মতো দীপ্তি! সেই আপন মনে নাচের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া।

সূর্য কখন যে ইতিমধ্যে প্রখরতর হয়ে দেখা দেয় বর্জুর খেয়াল থাকে না, হঠাৎ তার চমক ভাঙে। শালিখেরা কলহ শেষ করে বহুক্ষণ উড়ে চলে গেছে, তাদের কোন কলরব আর শোনা যায় না। বর্জু কী-একটা গানের কলি গুন্ গুন্ করতে করতে তাদের আস্তানার দিকে রওনা হয়।

সড়ক থেকে নেমে তাঁবুর দিকে রওনা হবার একটু পরেই মুখোমুখি দেখা শশীকলার সঙ্গে। কাছেই কোন্ পুকুর থেকে যেন 'চান' করে ফিরছে। মাথার ভিজে চুল চুড়ো করা, বাম বাহুতে ভিজে শাড়ী আর গামছা।

বর্জু রহস্য করে বলে,— শীতলজলে 'দেহ তাপ' জুড়াইলা নাকি?

কৌতুকে চিক্‌চিক্ করে ওঠে শশীকলার চোখদুটি, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—দেহ তাপ 'ডাকপাখী'রে দান করে আইছি, কান পেতে শুনো না কেনে? পাখী ভখন ডেকে ডেকে মইরছে!

সেই নির্জন গাছগাছালির ছায়ার মধ্যে শশীকলা দাঁড়িয়ে আছে, অর দূর থেকে করুণ গম্ভীর একটা স্বর শোনা যাচ্ছে, 'কুবু-কুবু,— কুবুকুবু!'

কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। শশী বলে,—কা গ, ডাক শুইন্যা 'উথাল পাথাল' হইলা নাকি? মন কেমন করে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বর্জু বলে,—তা তো করেই।

খিলখিল করে হেসে ওঠে শশী, বলে,—লাও, পথছাড়ো, যাই।

—আসো। পথ ত জুইড়ে রাখি নাই।

দুজনে পাশাপাশি হেঁটে তাঁবুতে ফেরে।

চলতে-চলতে বর্জু বলে,—তুমার লাচ মঞ্জরীরে শিখাইছি, জানো?

অবাক হয়ে শশী বলে,—তাই নাকি? নাচ্‌নেওয়ালী করতে চাও বউরে?

—না, সে ঘরওয়ালী থাইক্‌বে। ঐ দুইটাই একসঙ্গে।

শশী মুখ টিপে হাসে,—এই নাচ্‌নেওয়ালীটারে সত্যসত্যই মনের কোনায় একটুকু 'থান' দিছ নাকি ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বজ্রু বলে ওঠে,—দিছি গ, দিছি, সখীর স্থান, বন্ধুর স্থান।

অপরূপ এক তৃপ্তির আভায় ভরে ওঠে শশীকলার মুখ।

দিনকতক আরও কেটে যায়। কলকাতার সেই বাবুরা কী খেয়ালে সেদিন ওদের গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখতে বেরিয়েছে। সঙ্গে আছে কুঞ্জ প্রধান। কুঞ্জ হিসেবী মানুষ, ওদের সঙ্গ সে পারতপক্ষেও ছাড়ে না। ওদের সবারই সঙ্গে দিব্যি খাতির জন্মে গেছে তার।

মন্দিরের খনন-কার্য চলেছে, আর এ-কাজে তার পাড়ার লোকই কাজ পেয়েছে বেশী। সত্যি বলতে কী, পুরানো মন্দিরের খনন-কার্য সরকারী লোকেরা তাদের সাহায্যে এতদিনে প্রায় শেষ করে এনেছে। কিন্তু আজকাল বাবুরা পুরানো মন্দিরের কথা ছাড়া নতুন আবার একটা কী কথা বলাবলি করছে। নতুন মন্দির তুলবে নাকি ঐ পুরানো ভিটেটার পাশে ?

তাহলে অবশ্যই আনন্দেরই কথা, আরও অনেক কাজ হবে,—রাজমিস্ত্রি ছাড়া সাধারণ মজুরই ত দরকার হবে অনেক। সড়ঙ্গী বাবুদের কাছে থিক্যা সরকার নাকি উ-জমিনটার পাকা বন্দোবস্ত কইরে লিয়াছে। ইখন শুধু মন্দিরটা তুলতে পারলেই হয়,—বুঝলে হে টিকাইত মশায় ?

কুঞ্জ প্রধানের সঙ্গে প্রায় ছায়ার মতোই থাকে হরি টিকাইত, সে মাথা নেড়েনেড়ে সায় দেয়, বলে,—হঁ তো।

শিখা ব্যানার্জী কিন্তু তার বাবাকে বলে ওঠে,—আমার মন কিন্তু সায় দিচ্ছে না বাবা। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, চাঁদা তুলে বরং

তাদের খাওয়ান, নতুন মন্দির তোলার থেকে সে অনেক ভালো কাজ হবে।

অধ্যাপক হাসলেন, বললেন,—তুই ঠিক বুঝ্‌ছিস না মা। করুণা বা দয়া করে এ-ভাবে অন্নদান করলে ওদের সমস্যার কোনো সমাধানই তোরা করতে পারবি না। ওদের কাজ ওদেরই করতে দে,—আমাদের প্রয়োজন ওদের শুধু সচেতন করে দেওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ করে দেওয়া।

ছাত্রদের একজন বললে,—মন্দির তুলে সেটা সম্ভব হবে আপনি বলছেন?

উনি বললেন,—হ্যাঁ। মন্দিরের দার্শনিক ব্যাখ্যা এখানে নিরর্থক। আমি সামাজিক ব্যাখ্যাটাই দেবো। প্রাচীন প্রবুদ্ধ ভারতের আদর্শে মন্দির হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান,—ইন্‌স্টিটিউশন। দেবতা এখানে পবিত্রতার সাক্ষী মাত্র। দিনে মন্দির হচ্ছে বিদ্যালয়, এখানে পঠন-পাঠন হবে! সন্ধ্যায় নৃত্য-গীত, সভা, সামাজিক সম্মেলন। এইভাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে, নৃত্য-গীতাদির মধ্য দিয়ে, সভা-সমিতি-সামাজিকতার মধ্য দিয়ে,—গ্রামগুলির ঐক্যবন্ধন আরও দৃঢ় হবে, সংঘ-শক্তি বাড়বে। আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা যেতে পারে,—ক্রমে একদিন এই মন্দিরই হবে কো-অপারেটিভ স্টোর্স, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অনেক-কিছু।

অপর ছাত্রটি হেসে বললে,—আপনি বড্ড বেশী স্বপ্ন দেখছেন স্যর।

—স্বপ্নই দেখছি,—অধ্যাপক বললেন,—আমার নিজস্ব টাকা থাকলে আমার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে আমার দেরী হতো না।

—টাকার জন্য ভাববেন না স্যর,—ছাত্রটি বললে,—যে সাহায্য স্বাভাবিক ভাবে পাবো, তার ওপরে যা দরকার, তা দেবে পাবলিক। চাঁদা তুলবো।

—দেখা যাক।

কথা বলতে-বলতে ওরা তখন সেই স্থবির আমগাছটির তলায় এসে গেছে। এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে হঠাৎ শিখার চোখ পড়লো অদূরে, কোনো একটা কুটিরের দাওয়ার দিকে! পরক্ষণেই অস্ফুট একটা আর্তনাদ তুললো বলা যায়। তারপরে ছুটে গেল। হাতের মুঠোয় একটা অর্ধসমাপ্ত মাটির পুতুল, একটি শীর্ণ মানুষ দাওয়ার ওপর পড়ে আছে মুখ থুবেড়ে।

—জল—জল—বলে চীৎকার করে দাওয়ায় বসে তাড়াতাড়ি লোকটার মাথা তুলে নিলো শিখা তার কোলের ওপরে। ছাত্র ক'জন জলের জন্যে বাধিয়ে দিলো ছুটোছুটি,—অধ্যাপকও সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। শুধু কুঞ্জ প্রধান বুঝে উঠতে পারলো না, এতো লোক থাকতে ঐ কুঁড়ে—লক্ষ্মীছাড়া—হতচ্ছাড়াটার জন্য এঁদের এতো মাথাব্যথা কেন! ভারী ত কাজ করতে করতে একটু কাহিল হয়ে পড়েছে ছেলেটা,—তার জন্য আবার এতো?

—ইয়ারেই বুলে আদিখ্যেতা, বুইঝলে টিকাইত?

টিকাইত মাথা নাড়ে, বলে—হুঁ।

ছাত্রদের একজন হঠাৎ বলে উঠলো,—লাভ্‌লি? দেখ্‌ছেন স্যর?

আধ্যাপক নিবিষ্ট চিত্তেই মূর্তিগুলি লক্ষ্য করছিলেন, সংক্ষেপে শুধু বললেন,—দেখেছি। এ রিয়্যাল আর্টিস্ট।—তোমার নাম কী?

ওকে জোগাড়-যন্ত্র করে এক গেলাস দুধ এনে দেওয়া হয়েছিল, সম্ভবত কুঞ্জ প্রধানের বাড়ী থেকেই। মানিক সেই দুধের গেলাসটি খালি করে ঠক্‌ করে নামিয়ে রাখলো মাটিতে, তারপরে বললে,—মানিক্য।

—মূর্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য আছে। কী সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ!

ওদের হাতে-হাতে ফিরতে লাগলো রঙ্‌-না-করা নতুন মূর্তিগুলি। সব ক'টিই নারী মূর্তি। এবং সব ক'টিরই ভঙ্গিমা

নৃত্যের। উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে নিয়ে শিখা বললে,—নাচের সঙ্গে হাতের মুদ্রাগুলোও পারফেক্ট! এই নগণ্য দরিদ্র কৃষিজীবীদের পল্লীতে এভাবে এদের মধ্য থেকেই যে একজন প্রকৃত শিল্পী আবিষ্কৃত হবে, এটা কে ভাবতে পেরেছিল! মানিক্য, তুমি নাচের মুদ্রা শিখলে কোথা থেকে!

মানিক 'মুদ্রা' কথাটার অর্থ সঠিক বুঝতে না পেরে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইলো মেয়েটির দিকে, তারপরে বললে,—আমি কিছুই শিখি নাই! যা একটু-আধটু করেছি, তা সবই মন থিক্যা।

একজন ছাত্র বললে,—একেবারে মন থেকে—নিছক বানিয়ে বানিয়ে কী এ জিনিস হয়? একটি কিছু আদল বা ডৌল নিশ্চয় তুমি পেয়েছো কোথা থেকে!

কথাটা শুনেও বুঝতে সময় লাগলো। আর বোঝামাত্রই, সর্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

যে-কথা কেউ জানে না, মঞ্জরী জানে না, বজু জানে না,—সে কথা এতদিন গোপনে রেখে এদের কাছে হঠাৎ তা প্রকাশ সে করবে কেমন করে?

সে-এক অদ্ভুত জ্যোৎস্না রাত্রি। চুপচাপ একা একা বসে ছিল মানিক, ঘুম তার কিছুতেই আসতে চায় না, হঠাৎ কী খেয়ালে,—অথবা বলা যায়,—অদৃশ্য এক অমোঘ শক্তির টানে,—সে গিয়ে ধীরে ধীরে উপস্থিত হয়েছিল বজুদের উঠানে। বজুকে ডাকাই তার উদ্দেশ্য ছিল, হয়ত কিছুক্ষণ বজুর সঙ্গে গল্প করে সে ফিরে আসতো। কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে চাপা একটা ঢোলের ছন্দ তাকে কৌতূহলী করে তুললো।

চুপি চুপি দাওয়ার ওপর উঠে দাওয়ার দিককার ঝাঁপে-ঢাকা জানালাটার ঝাঁপ সরিয়ে—সে যা সেদিন দেখেছিল,—তা কী জীবনে বিস্মৃত হবার?

ঘরের ভিতর কিছুটা জায়গা ও-পাশের বড়ো জানালা

দিয়ে গলে আসা পুঞ্জীভূত জ্যোৎস্নার আলোকে উদ্ভাসিত। সেই আলোকের উচ্ছ্বাসে আত্মহারার মতো নৃত্য করে চলেছে মঞ্জরী,—শরীরে কোনো আবরণ নেই,—যেন সঞ্চারিণী বিদ্যুৎশিখা!

কয়েকটি মুহূর্তের আত্ম-বিস্মরণ, কিন্তু তারপরেই সম্বিত ফিরে পেয়েছিল সে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসেছিল নিজের ঘরে। সে যেন সেদিন এক অলোকসামান্য—অপার্থিব সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে এসেছিল! এবং, কেউ জানে না, সেই অভাবিত 'দর্শন-ই ত তার সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মূলে।

ছাত্রটি তার প্রশ্নের কিন্তু কোনো উত্তর পেলো না। তার জিজ্ঞাসার উত্তরে মুখ নীচু করে অল্প একটু হাসলো মানিক্য, কিছু বললো না।

ছাত্রটি আর ওকে পীড়াপীড়ি করলো না অবশ্য, তার পাশের সতীর্থটির দিকে তাকিয়ে শুধু বললো,—সত্যিকার শিল্পী। যাকে বলে ইন্‌স্পায়ার্ড আর্টিস্ট! অধ্যাপক একটি মূর্তি নিয়ে বিশেষ ভাবে অবলোকন করছিলেন, ছাত্রটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো? কী পারফেক্ট অ্যানাটমির জ্ঞান!

শরীর-তত্ত্বের ইঙ্গিতে শিখার মুখে আবির ছড়িয়ে পড়লো যেন। চট্ করে সে মুখ নামালো। অপর ছাত্রটি বললে,—এই অবহেলিত গ্রামের শিল্পীদের বাঁচানোর জন্যও মন্দির দরকার, মন্দিরের শিল্প-কার্যের দরকার,—নয় কী স্যর? অধ্যাপক বললেন,—সব থেকে বড়ো দরকার—শিল্পবোধ। এইসব দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত গ্রামে মানুষ অনুক্ষণ নিছক জীবন-সংগ্রামে রত থাকে বলে, মন সচরাচর বড়ো বিষয়ী হয়ে পড়ে। অথচ, একথা ত ঠিক, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা স্বতস্ফূর্ত শিল্পবোধ আছে। এই শিল্পবোধেরই সম্যক অনুশীলন

দরকার। জীবন-বোধের সঙ্গে শিল্পবোধ এক না হলে জীবন সুন্দর হয় না।

শিখা বললে,—আমার একট সাজেশন আছে বাবা। আমাদের যে নতুন মন্দির তোলা হবে, তাতে শিল্পী করে দেওয়া হোক এই মানিক্যকে। ও খোদাইয়ের কাজ জানে না। কিন্তু ওর মূর্তি ও পুড়িয়ে পাকা করে দিতে পারবে। বাঙ্‌লার টেরাকোটা আর্টের এক নতুন রূপায়ন হোক।

অধ্যাপক বললেন,—বেশ বলেছিস কথাটা। আমার এতে সম্পূর্ণ সায় আছে। আগামী মিটিংয়েই আমি কর্তার কাছে আমাদের প্রস্তাব পেশ করবো, কী বলো?

অদম্য উল্লাসে ঝলোমল করে উঠলো শিখা, বললে,—শুনলে ত মানিক্য? তুমি হবে আমাদের মন্দিরের শিল্পী। মূর্তির পর মূর্তি গড়ে দেবে আমাদের মন্দিরের জন্যে।

—আমি!—বিস্ময়ে-আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে মানিক্য।

শিখা লীলায়িত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, বলে,—হ্যাঁ, তুমি।

এরপরে কয়েকটি দিন যেন নেশাগ্রস্তের মতো কেটে যায়। তাকে কিনা কাজ করতে হবে মন্দিরের! মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে সাজিয়ে দেওয়া হবে তারই নিজের হাতে গড়া মূর্তি? আনন্দের আবেগে যেন চুরমার হয়ে যাবে মানিক্য।

ওদিকে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার, গ্রামের লোক এতদিনে কৌতূহলী হয়ে ওঠে তার কাজের প্রতি। অবাক হয়ে তাকায়। হরি টিকাইত ভোরবেলা তাকে চন্দনের ফোঁটা আর ফুল দিতে আসে, এবং কী আশ্চর্য, তার জন্য সে পয়সা চায় না। বলে,—পিছে দিস। যেখন তুর অঢেল ট্যাকা হবেক, তিখন দিস্।

গ্রামের মাতব্বররা তাদের এই অকর্মণ্য ছেলেটার দিকে সত্যিই অন্য চোখে তাকায়। এই পাগল ছেলেটা কিনা কাজ করবে বাবুদের মন্দিরে? জনমজুরের কাজ নয়, শিল্পীর কাজ! বাবুরা এসে ওরই দাওয়ায় ভীড় করে গেছে, সোজা কথা নয়! কী জানি কী আছে গ ছেইলেটার মইধ্যে?

শুধু এই গ্রামেই বা কেন, আশেপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে তার কথা। গ্রামান্তরের প্রধানরা জিজ্ঞাসা করে কুঞ্জকে,—তুমাদের মানিক নাকি—!

কুঞ্জের তখুনি নতুন করে মনে পড়ে, মানিক তার গাঁয়েরই ছেলে, তার গৌরবে তার গ্রামেরই গৌরব, বলে,—হঁ—গ, আমাদেরই মানিক মন্দিরে কাজ করবেক।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা স্নেহাপ্লুত আবেগ অনুভব করে কুঞ্জ প্রধান,—ছেলেটার সত্যই শক্তি আছে! বাবুদিগের টেইনে এইস্‌ছে কিনা আপন দাওয়াটিতে, না খেইয়ে-দেইয়ে খালি পুতুল গইড়ে?

এক সময় গ্রামের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দাঁড়ায় গিয়ে ছেলেটার ঘরের দাওয়ায়, হেঁকে বলে,—মানিক আছিস? দুটি হাতে কাদা শুকিয়ে আছে, অনাহারে শীর্ণ কৃষ ছেলেটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ঘরের ভিতর থেকে, একটু অবাকই হয়ে বলে,—আপনে!

কুঞ্জ বলে,—হঁ—আমিই বটে। মূর্ত্তি ত গড়ছিস, বাবুরা পরে ট্যাকাও দিবেক, কিন্তু ইখন খাবিটা কী, ভেবেছিস?

হাসিমুখে ছেলেটা বলে—কাল হাট ছিল পচ্চিম গেরামে, বাবুরা আমার মূর্ত্তিগুলোরে ভালো বুইলেছে বলে, খুব বিকাইছে গ' হাটে। দুই ট্যাকা বারো আনা রুজগার হইছে গ কাল। তা—ইয়া দিয়ে আমি দিনকতক বেশ চালাই নিতে পারবু।

ওর উজ্জ্বল মুখখানার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কুঞ্জ প্রধান, ভাবে,—কী রকম মানুষটা হে এই মানিক! দিনের পর দিন উপাস

দেয়, তেবেও মুখের হাসি নিভে না, তেবেও কামাই দেয় না মূত্তি গড়ার।

মানিক বলে,—ইকটা কথা বুলব?

—কী কথা?

—সেই বাবুরা—সেই দিদিমনি—উয়ারা আর আইস্যেছিল?

কুঞ্জ বললে,—তু গেরামে থাকেস, না, কী? বাবুরা আসিল ঐ কপাল ভাঙার মাঠে, মন্দির তৈয়ারীর কাজ শুরু হই গেল,—তু কি কুনো খবর রাখিস নাই?

—মন্দিরের কাজ সুরু হইছে?

—হঁ তো,—কুঞ্জ বলে,—বাবুরা বুলছিল, হাঁই বড়ো হবেক মন্দিরটা, পাহাড় চুড়াটির মতো। অনেক ট্যাকা লাগবেক?

—আমার কথা বুলে নাই কিছু?

কুঞ্জ বললে,—নতুন কথা কী আর বুলবে? তুই তুয়ার কাজ শুরু কইরেদে—মূত্তি গড়।

বহুদিন পরে হঠাৎ সেদিন বর্ষা নামলো। অকাল বর্ষা। শীত-শীত দিনে আরও শীত নেমে এলো হঠাৎ। মানিক ঝাপ্‌সা বাড়ীঘর আর গাছপালার দিকে তাকিয়ে ঘরের কোন থেকে সন্তর্পণে বার করে আনে একটা মূর্তি। আকারে বেশ বড়ো। মূর্তিটি মাটির, এখনো রঙ পড়েনি। যদি পোড়াতে হয়, রঙের প্রয়োজনও হবে না। মূর্তিটি নৃত্যরতাই বটে, তবে নিরাবরণ। এ মূর্তিটা দেখে বাবুরা কি বুলবে জানি না, ই মূর্তিটা আমি মন্দিরে দিব না—কাউকে দিবু না—ইটা থাকবে আমার। ইটা বজুকে পর্যন্ত দিখাবার লয়।

মনে মনে তন্ময় হয়ে ওই সবই ভাবছে মানিক মূর্তিটা হাতে নিয়ে,—এমন সময় হঠাৎ একেবারে হুড়মুড় করে দাওয়ায় এসে পড়লো মঞ্জরী, ভিজে শাড়ীর জল নিংড়ে পড়ে দাওয়ার মাটি

ভিজিয়ে দিলো খানিকটা। সেই ভিজে মাটি আর পা-ছুখানি থেকে চোখ উঠিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায় মানিক।

মঞ্জরী বলে,—তুমি নাকি মন্দিরের কাজ পেইয়েছ?

—হঁ।

—সত্য!—বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে মঞ্জরী। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, ভিজে শাড়ী নিটোল শরীরের সঙ্গে মিশে আছে,—ভিজে চুল দিয়ে জল পড়ছে ছুই গাল বেয়ে। দূরে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, তারই আলোয় ক্ষণিকের জন্যে ঝিলমিল করে উঠেছে জলের বিন্দু।

মানিক বললে,—ভিজে-ভিজে এলেই যে? এমন করো ভিজতে আছে?

মঞ্জরী বললে,—হঁ—আছে। জান, তোমার সাঙাতের আবার খৎ এইস্‌ছে। লিখ্যাছে—মন খারাপ করবু না, আমি ফির‍্যা আস্‌ছি মাসখানিকের মইধ্যে। আমার মনে খুব আনন্দ হইছে জান? ভাব্‌লম, সুখীর মা বিপারটা ভালো চউখে দেখুক আর না দেখুক, আমি তুমারে খবরটা দিবুই। তাই ভিজে ভিজে চইলে এইলম। দোষ কর‍্যাছি?

মুগ্ধ চোখে তাকায় মানিক, বলে,—না

হঠাৎ এই সময় ওর হাতের মূর্তিটার দিকে চোখ পড়ে যায় মঞ্জরীর। উৎসুক কণ্ঠে বলে—উটা কী, দেখি?

মূর্তিটা নিজের পিছনে নিয়ে গিয়ে লুকোতে চেষ্টা করে মানিক, বলে,—ইটা দেইখ্যো না। ইটা আমার। কাউরে জানাবার লয়।

ওর একেবারে কাছে সরে এলো মঞ্জরী, তারপরে ওর গায়ের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েই মূর্তিটি কেড়ে নেয় মঞ্জরী, তারপরে ভালো করে দেখতে গিয়েই লজ্জায় আরক্ত হয় ওঠে মুখখানা। মূর্তিখানা তাড়াতাড়ি একপাশে রেখে দিয়ে মুখ ফেরায় অন্যদিকে, বলে,—ছি—ছি।

মানিক হঠাৎ নীচু হয়ে ওর দুটি পা দুই হাতে চেপে ধরে, বলে,—দোষ ধইরো না! আমি কু-দৃষ্টিতে দেখি নাই।

মঞ্জরী মৃদুকণ্ঠে বললে,—ইটা ভুলো কাঁয়, যে আমি পরের বউ বটে। ইটা বড় পুতুল কইরছো, গেরামে যি দেখবু, সেই বুলব,, মূর্তিটার মুখখানায় কার আদল আসে। সক্কলে চিনা ফেল্যাবে। তেখন?

—ইটা আমার নিজের জন্য। কাউকে দেখাবু নাই।

মঞ্জরী বলে,—আচ্ছা একটা কথা শুধাই। আমারে একটা মূর্ত্তি দিতে তুমার ইচ্ছা করে না?

—করে,—মানিক্য বলে,—বর্জু এলে বর্জুর হাতে দিবু।

হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেলে মঞ্জরী, মুখখানা আবার আরক্ত হয়ে ওঠে, কোনক্রমে বলে, তেবে একটা কাজ কইরো। তার হাতে তুমার এই মূর্ত্তিটাই দিও।

বলেই আর দাঁড়ায় না, যেমন হুড়মুড় করে হঠাৎ এসেছিল, তেম্‌নি ঝড়ের মতোই চলে যায় মঞ্জরী।

ওদিকে দিন ঘনিয়ে আসে। বর্জুরও সময় হয়ে গেছে আসবার। মঞ্জরী একদিন হরতুকীতলা থেকে একখানা পোস্ট কার্ড-আন্দোলিত করে দেখায়,—পরশু আস্‌ছে গ, পরশু।

মানিক্য বলে,—আসবু না?

মঞ্জরী দূর থেকেই হাসতে-হাসতে বলে,—না।

মানিক্য বলে,—পরশু আইস্‌ছে ত, ভালো সাজ-সাজ করবু। পায়ে আলতা দিবু, কপালে কাঁচপোকার টিপ্।

মঞ্জরী হাসতে থাকে,—আর শাড়ী?

মানিক্য বলে,—সেই হলুদে শাড়ীটা পরবু।

মঞ্জরী চটুল হাসিতে উচ্ছল হয়ে কয়কটা পা ওর দিকে এগিয়ে আসে, বলে,—উ যেখন ঘরকে আসবে, তেখন আমি কিছুই পরবু না—তুমার হাই মূর্ত্তিটার মতন।

বলেই, আরক্ত মুখে হুদ্দাড় করে ছুটে পালায় নিজের ঘরের দিকে।

মনিকের তখন নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। মন্দিরের জন্য মূর্তির পর মূর্তি গড়ে চলে। সবই প্রায় নাচের ভঙ্গী। মানিকের মূর্তি-গড়ার মধ্যে সত্যিই একটা নিজস্ব ভাব আছে। সুসামঞ্জস্য মূর্তিগুলি, আর মনে হয়, গতিশীল ওরা।

কুঞ্জ প্রধান এসে খোঁজ নিয়ে যায়, গ্রামের লোকেরা এসে দেখে যায় অবাক হয়ে। কুঞ্জ এলেই কুচোকাঁচার দল সব ফাঁকা।

কুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করে মানিক্য,—কেতোদূর হইল মন্দিব? আমি কবে যাবু, বল?

চট্ করে উত্তর দিতে পারে না কুঞ্জ প্রধান। অথচ, না দিলেই নয়। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে ছেলেটা দিনরাত, ঘরের দাওয়ায়, এক-ভাবে ঠায় বসে বসে। বলতে গিয়ে চোখ দুটো ভিজে ওঠে কুঞ্জর, কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে,—মন্দিরের কথা বুলছিস্? তা উয়া ত পেরায় শেষ হইলো। কম লোক খাটে উখানে? সেই কপাল ভাঙার মাঠ তুই চিনতেই পারবু না। যাস না তু কখনো ও-দিগরে. তেবে জানবু কী।

—আমি কবে যাবু আমার মূর্ত্তিগুলান লিয়ে?

সংক্ষেপে বলে কঞ্জ প্রধান,—ত্বরিৎই যাবু! ভাবন নাই।

পাগল ছেলেটা সত্যিই কোনো খোঁজ রাখে না। কদিন ধরে সারা গ্রাম জুড়ে এ-নিয়ে চলেছে চাপা উত্তেজনার ভাব, তা ও বিন্দুবিসর্গও জানে না। গ্রামের প্রায় সবাই জেনে গেছে, কিন্তু ওর দুঃখে তারা আজ সমান দুঃখী বলে ওকে এ-দুঃসংবাদ কেউ দিতে পারে নি। আজ দুঃখের দিনে অনেক ব্যবধান ঘুচে গেছে তাদের।

আসল খবর হলো এই—

মন্দির প্রস্তুত হচ্ছিল চাঁদা নিয়ে। পুরাতন মন্দির সংস্কার, সেটা ত সরকারী কাজ। কিন্তু তার সীমানার বাইরে যে নতুন মন্দির ওরা তুলছিল ওদের পরিকল্পনা মতো,—সেই ব্যাপারে—

সুযোগ বুঝে নাম করবার লোভে এসে পড়লেন ধনী ব্যবসায়ীরা। টাকা ঢালতে লাগলেন অজস্র,—খবরের কাগজে ছাপা হতে লাগলো নাম। বিরাট মন্দির হবে ওটি। কিন্তু যেখানে এই রকম এলাহী কাণ্ড, সেখানে নগণ্য গ্রাম্য শিল্পীর স্থান কোথায়? দেশ-বিদেশ থেকে আসছে নাম-করা শিল্পীরা। সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক, তাঁর কন্যা আর ছাত্রদলের প্রস্তাব প্রবল স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে গেছে।

সব থেকে বেশী দুঃখ পেয়েছিল কুঞ্জ প্রধান। শুধু দুঃখ নয়, একটা অব্যক্ত জ্বালাও যেন জ্বলতে লাগলো অন্তরটায়। বাবুরা এতো আশা দিয়ে গেল,—অথচ, আজকের এই তীব্র তাচ্ছিল্যের দিনে তাঁরা ত কেউ এগিয়ে এলেন না কাছে! ঐ অবুঝ ছেলেটা যখন আবার 'জ্যেঠা' বলে ডাকবে, তখন কী উত্তর দেবে সে? উত্তেজনায় মাথার পাগড়ীটা টান মেরে খুলে ফেলে কুঞ্জ প্রধান। দরকারই নাই আমার পরাধানগিরির, বুঝলে হে টিকাই?

হরি টিকাইত নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। শুধু ওরা দুজনই নয়, গ্রামের সব মাতব্বরদের নিয়ে রোজই পরামর্শ-সভা বসে। সবাই আজ একযোগে ভাবছে,—কী করা যায়?

কে যেন বললে,—রাইতের বেলা,—লুকায়ে গিয়ে উয়াদের মন্দিরটা চল চুরমার কইরে দিয়ে আসি।

কুঞ্জ বলে,—লয়। শুন তুরা। আমার মাথায় একটা মতলব আস্‌ইছে।

আবার একদিন খৎ আসে বজুর কাছ থেকে।

না গ—আরও দিন পনেরো দেরী হবে যাইতে, কলকাতার বাবুরা আমাদের ছাড়ছে নাই।

মঞ্জরী ওর কাছে এসে বলে,—এইরকম দিন-রাতে কাজ করলে তুমি মর‍্যে যাবে।

মানিক্য হাসে, বলে,—মন্দিরে যেখন উয়ারা সব সাজাই দিবেক, তেখন আনন্দটা কী রকম হবে, সিটা বল ?

মঞ্জরী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়েও পারে না। কেমন যেন মায়া হয়। নইলে, কথাটি তারও কানে যে না গেছে এমন নয়। মঞ্জরী মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে আসে নিজের ঘরে।

সুখীর মা বলে,—এতোটা ভাল লয়। স্বামী নাই ঘর, উয়ার কাছে অতো যাওয়া-আসো কেনে ?

মঞ্জরী হাসে, বলে—ই কারণটা তুমি বুঝতে লারবে গ মাউসী।

জ্যেঠা !

কুঞ্জ প্রধান সেদিন ছুটে এলো ওর কুটিরে, ধরলো ওর হাত শক্ত করে, তারপরে বললো,—আয় আমার সঙ্গেরে !

—কুথায় জ্যেঠা ? মন্দিরে আমার ডাক পইড়াছে !

—হুঁ। ডাক পইড়াছে। আয়।

কুঞ্জ প্রধানের ভিটের সংলগ্ন ফাঁকা জমি ছিল অনেক। তার নিজেরই জমি। সে বলতো,—বাপদাদার আমলকার লাখেরাজ সম্পত্তি। সেই জমিরই একধারে সে পাকা ঘর তুলবে বলে পাথর জমিয়ে রেখেছিল বহু। পাথর আর ইট। আজ দেখা গেল, সেখানে বহু লোকের জটলা। যে-পথ দিয়ে ঘুরে সে জ্যেঠার সঙ্গে গেল ঐ জমিতে, সেই পথে চোখে পড়লো কতো ছোট-ছোট জীবন-যাত্রার ছবি। একটা ঝক্‌ঝকে উঠোনে একটা ধব্‌ধবে বাছুর খেলা করছে তার মায়ের সঙ্গে। অদূরে মেয়েরা কোমরে কাপড় জড়িয়ে কাঠের দণ্ড হাতে মশ্‌লা পিষছে। অন্য ঘরে ঢেঁকিতে পড়েছে পাড়। কার দাওয়ার কোনে বাখারীর বেড়া। সেই বেড়ার মধ্যে

ঝামা-দেওয়া নগ্ন শিশুকে রেখে মা গৃহকাজ করছে। ছেলে বাখারীর বেড়ার ধারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—জি—জি—জি!

মা শুনে বলছে, -যাই গ সুণামনি, যাদুমনি, খিদা লাইগ্‌ছে! —অনেকক্ষণ মারে পাউনি কেমন?

এ-সব পার হয়ে সে যখন কুঞ্জ প্রধানের সেই ফাঁকা জমিটার ওপরে এসে দাঁড়ালো, তখন দেখলো, গ্রামের মেয়েরা মাথায় করে নিয়ে আসছে জালায় ভর্তি জল। কেউ-কেউ মাথায় চুবড়ী বসিয়ে নিয়ে আসছে বড়ো-বড়ো মাটির ঢেলা। পুরুষদের অনেকেরই হাতে কোদাল। দেখে মনে হলো, কী স্ত্রী, কী পুরুষ, সব মানুষগুলিই আজ দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে কী এক কঠোর সংকল্প নিয়ে। মনে হচ্ছে, আধমরারা যেন ঘা খেয়ে বেঁচে উঠেছে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে সবাই। ওকে আর কুঞ্জকে দেখে কিছু লোক এগিয়ে এলো কাছে।

এতক্ষণ পরে কুঞ্জ প্রধান বললে,—মানিক্য? তুয়াকে উয়ারা তাড়াই দিছে মন্দির থিক্যা। উখানে শহর থিক্যা শিল্পীরা আইসছে, তাম্বুতে বাস কইর্‌ছে, উখানে তুয়ার আর 'থান' নাই।

—নাই!—অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে মানিক্য, তারপরে বসে পড়ে একটা বড়ো গাছের শিকড়ের ওপর।

কুঞ্জ প্রধান দৃঢ় কণ্ঠে বলে,—না, তুয়ারে বইসে পড়লে চল্‌বু না! ই দেখ, তুয়ার মন্দির। আমরা গেরামের প্রতিটি মানুষ পালা কইরে খাইটে আমাদের নিজেদের মন্দির গইড়ে তুলবার মত কইরেছি। আজ উয়ার পত্তন বটেক। চক্ষু তুইলে দেখ, মেইয়েরা পর্যন্ত কাজে নাইমে পইড়ছে নিজ ইচ্ছায়।

সত্যিই দেখবার মতো দৃশ্য বটে। পুরুষরা মাটি কাটছে, মেয়েরা নিয়ে আসছে সেই মাটি মাথায় করে। একটি ছোট্ট ছেলের মুঠিতে মাটির ঢেলা। ঐ ওদের উঠোনে সেই বাছুরটি, সেই দাওয়ার-বেড়ায়-বন্দী শিশুটি, ঐ মেয়েদের জালা মাথায় বসিয়ে জল নিয়ে আসা, ঐ পুরুষদের মাটি-কাটার কাজ, সব মিলে জীবনধারার একটা অখণ্ড

সুর। মানুষ তার জীবনের কর্মছন্দ দিয়ে এম্‌নিভাবেই ত ফুটিয়ে তুল্‌ছে আনন্দকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটাকে দৃঢ় করে নিয়ে মানিক্য উঠে দাঁড়ায়। এই তো তার সত্যিকার কর্মক্ষেত্র। এই তো তার কাজ। শুধু নৃত্য নয়, জীবনের প্রতিটি চিত্রকে সে ফুটিয়ে তুলবে তাদের নিজেদের মন্দিরটির গায়ে। ঐ মায়ের হাত ধরা ছেলে, ঐ সেই নতুন বাছুরটি, ঐ মেয়েদের জল তুলে আনা—মাটি বয়ে আনা!

দুনিবার আনন্দের আবেগে যেন চুরমার হয়ে যাবে মানিক, ধপ্‌ করে বসে পড়ে কুঞ্জ-প্রধানের দুটি পায়ে হাত দেয়, বলে,—জ্যেঠা।

কুঞ্জ ওকে দু হাতে তুলে ধীরে ধীরে উঠিয়ে দেয়।

মাথায় করে মাটি বয়ে নিয়ে আসতে আসতে মঞ্জরী একটু থম্‌কে দাঁড়ায়, হল্‌দে শাড়ীর আঁচলটা ঠিক করে নেয় একবার, তারপরে এগিয়ে আসে ওর দিকে, হাসি মুখে। আয়ত দু'টি চোখের তারায় যেন জ্বলছে আরতির দীপ, যেন শিল্পীদেবতাকে অভিনন্দন জানায় ঐ দুটি দীপ্ত চোখ, বলে,—তোমাকে চিনেছি শিল্পী, তুমি শুধু এগিয়ে চলো—দিন থেকে দিনান্তরে—কাল থেকে কালান্তরে। তুমি সব রকম গণ্ডী পার হয়ে চলে যাও। জীবন থেকে এগিয়ে যাও,—এমন কি প্রেম থেকেও এগিয়ে যাও,—তারপর করো তোমার অবিস্মরণীয় শিল্প সৃষ্টি! আমরা কেউ তোমার নাগাল পাবো না, এইটাই হবে আমাদের সব থেকে বড়ো গৌরব।

কিন্তু, ওরা কেউ জানে না, সবার অজ্ঞাতে ওরা কী অসাধারণ সৌধ নির্মাণে সমবেত শক্তি নিয়োজিত করেছে!

ইতিহাসের সেই অধ্যাপক জানতেন না, এমনকি, কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার সেই মল্লবংশীয় সামন্তও জানতেন না, অথচ, ওরা না-জেনে সঠিক স্থানটি নির্বাচিত করে বসে আছে।

মল্লবংশীয় সামন্ত ভ্রম করে কাছাকাছি একটা যায়গায় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন,—পট্টোলী-কথিত মন্দিরের স্থান বুঝি এইটাই।

আজকের দিনে ইতিহাসের অধ্যাপক তার পাশেই স্থান নির্দেশ করলেন, তিনিও যথার্থ ভূমিখণ্ডের সন্ধান পেলেন না।

সন্ধান পেলো ওরা, যারা দীন দরিদ্র গ্রাম্য জনগণ। ওরা আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বুঢ়ন মিশ্রের প্রাচীন পাদপীঠেই নির্মাণ করতে শুরু করলো ওদের বিজয়-তোরণ। আটশো বছর আগেকার প্রাচীন ইতিহাস আর বর্তমানের পটভূমিকা রচনা করলো। তাঁর অশ্রুত সঙ্গীত ভেসে বেড়াতে লাগলো বুঝি পাখীর কণ্ঠে মুখর হয়ে, আর আটশো বছরে আগেকার দিব্যোক বুঝি এ-যুগের মানিক্য হয়ে রচনা করতে লাগলে জনপদের জীবনশিল্প। হয়তো এই মঞ্জরীই তার সেই আটশো বছরে আগেকার হারানো প্রিয়া কিনা কে বলতে পারে।